বুলিং

বুলিং প্রতিরোধে অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য
একটি সহজ নির্দেশিকা।



খাঁন মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান

বুলিং

বুলিং প্রতিরোধে অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য একটি সহজ নির্দেশিকা।

লেখকের কথা

বইটির নাম যখন আপনি দেখছেন, তখন হয়তো মনে হতে পারে এটি কেবল একটি গবেষণাপত্র বা কিছু তাত্ত্বিক আলোচনার সংকলন । কিন্তু এই বইয়ের প্রতিটি শব্দের পেছনে লুকিয়ে আছে আমার নিজের শৈশবের এক দীর্ঘশ্বাস। আজ আমি একজন গবেষক হিসেবে মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছি এবং মানুষের আচরণের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু এই যাত্রার শুরুটা হয়েছিল কয়েক দশক আগে, যখন আমি নিজেই ছিলাম বুলিং-এর এক অসহায় শিকার।

শৈশবের সেই দিনগুলোর কথা আজও আমার মনে পড়ে। সেই সময় আমাকে নিয়ে করা সহপাঠীদের বিদ্রূপ, নাম ধরে ডাকা বা সবার সামনে ছোট করার সেই স্মৃতিগুলো আজও আমাকে তাড়া করে ফেরে । যদিও সেই ঘটনাগুলোর বয়স এখন অনেক বছর, কিন্তু এর প্রভাব আজও আমার বর্তমান জীবনে রয়ে গেছে । আজও মাঝেমধ্যে মিটিংয়ে সবার সামনে কথা বলতে গেলে বুক ধড়ফড় করে ওঠে কিংবা নতুন মানুষের সাথে মিশতে এক অদৃশ্য জড়তা কাজ করে ।

মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে, বুলিং কেবল সাময়িক কোনো দুষ্টুমি নয়; এটি একটি শিশুর মানসিক কাঠামোকে স্থায়ীভাবে দুমড়েমুচড়ে দিতে পারে । আমার নিজের জীবনের সেই অদৃশ্য শিকলগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়েছে যেন অন্য কোনো শিশুকে আবির বা সুমনার মতো ভাগ্য বরণ করতে না হয় ।

আমি এই বইটি লিখেছি একজন গবেষকের নির্লিপ্ততা থেকে নয়, বরং একজন ভুক্তভোগীর সহমর্মিতা থেকে। আমি চেয়েছি অভিভাবক এবং শিক্ষকদের হাতে এমন একটি নির্দেশিকা তুলে দিতে, যা দিয়ে তারা শিশুদের মনের গোপন ঝড়গুলো বুঝতে পারেন । বুলিং-এর এই অদৃশ্য ক্ষত যেন কারো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে ম্লান করে না দেয়, সেই লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

মনে রাখবেন, আমাদের ছোট্ট একটি সচেতনতা এবং শিশুর পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়ানোর সাহসই পারে একটি প্রাণবন্ত প্রজন্ম গড়ে তুলতে । আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলি যেখানে প্রতিটি শিশু নিজেকে নিরাপদ এবং সম্মানিত মনে করবে ।

খাঁন মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান
গবেষক, মনোবিজ্ঞান

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: বুলিং আসলে কী? ৫

অধ্যায় ২: আমার সন্তান কি বুলিং-এর শিকার হচ্ছে? ৯

অধ্যায় ৩: আমার সন্তান যদি অন্যকে বুলিং করে? ১৩

অধ্যায় ৪: ক্লাসরুমে শিক্ষকের ভূমিকা ১৬

অধ্যায় ৫: নিরাপদ স্কুল গড়ার পদক্ষেপ ২২

অধ্যায় ৬: ডিজিটাল যুগের বিপদ (সাইবার বুলিং) ৩০

অধ্যায় ৭: চুপ করে না থেকে প্রতিবাদ ৩৭

অধ্যায় ৮: বুলিং-এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ৪৪

অধ্যায় ৯: ডিজিটাল সুরক্ষা ও প্রাইভেসি ৫১

অধ্যায় ১: বুলিং আসলে কী?

আবিরের টিফিন বক্স

আবির ক্লাস সিক্সের শান্ত একটা ছেলে। ওর পৃথিবীটা অংকের হিসেব আর বিজ্ঞানের বই নিয়ে। অংক করতে বসলে ও সব ভুলে যায়। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে আবির যেন অন্য এক মানুষ। প্রতিদিন সকালে স্কুল ড্রেসটা সামনে দিলেই ওর বুক ফেটে কান্না আসে। কখনো পেটে ব্যথার বাহানা করে বিছানায় পড়ে থাকে, কখনো বা চুপচাপ জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আবিরের মা ভাবলেন, হয়তো পড়াশোনার চাপ বা সামনে কোনো কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল আরও গভীরে। টিফিন পিরিয়ডে যখন ক্লাসের সবাই হাসাহাসি আর খেলায় মেতে ওঠে, তখন আবিরের জন্য শুরু হয় এক দুঃস্বপ্ন। ক্লাসের গুটিকয়েক ছেলে ওকে ঘিরে ধরে। হঠাৎ একজন ওর চশমাটা টেনে নিয়ে উঁচুতে ধরে রাখে। আবির ঝাপসা চোখে সেটা ফেরত পাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেই সবাই মিলে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে— "চশমা-ভুত! চশমা-ভুত!"

আবির যখন কান্নাভেজা গলায় মিনতি করে বলে, "প্লিজ, আমার চশমাটা দাও, আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না," তখন তারা উল্টো ওকে ধমক দিয়ে বলে— *"আরেহ, একটু মজাও নিতে পারিস না? এতো 'আনস্মার্ট' আর 'প্যানপ্যানে' কেন তুই?"*

এই যে একটি শিশুর শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা এবং তাকে সবার সামনে ছোট করা—এটাই হলো বুলিং।

এটা কি শুধুই মজা?

আমাদের সমাজে একটা খুব সাধারণ কথা প্রচলিত আছে— *"আরে ছোট মানুষ, ওরা তো একটু আধটু দুষ্টুমি বা খুনসুটি করবেই!"* এই একটি কথা দিয়ে আমরা অনেক সময় বড় ধরণের

মানসিক হেনস্তাকে এড়িয়ে যাই। কিন্তু মা-বাবা এবং শিক্ষক হিসেবে আমাদের বুঝতে হবে, **'খুনসুটি'** আর **'বুলিং'** এক জিনিস নয়।

নিচের এই সহজ পার্থক্যগুলো খেয়াল করুন:

- **মজা (Joke):** মজা তখনই হয় যখন বিষয়টি সবার জন্য আনন্দদায়ক। যেখানে সবাই একসাথে হাসে এবং কেউ মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে কষ্ট পায় না। মজার শেষে কারো মনে কোনো ক্ষোভ বা ভয় থাকে না, বরং বন্ধুত্ব আরও বাড়ে।
- **বুলিং (Bullying):** বুলিং হলো সেই অবস্থা, যখন এক পক্ষ আনন্দ পায় কিন্তু অন্য পক্ষ মনে মনে কাঁদে। এখানে একজন শক্তিশালী সাজে আর অন্যজনকে অসহায় করে ফেলে।

আবিরের বন্ধুরা যেটা করছে, সেটা কোনোভাবেই মজা নয়; সেটা **বুলিং**। কারণ এই ঘটনায় আবির হাসছে না। আবির লজ্জা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে এবং সবার সামনে নিজেকে খুব তুচ্ছ আর ছোট মনে করছে।

আমরা কী করতে পারি?

বুলিং রুখতে হলে কেবল অভিযোগ করলে হবে না, সমাজ ও স্কুলের প্রতিটি মানুষকে নিজের জায়গা থেকে এগিয়ে আসতে হবে। আবিরের মতো শিশুদের বাঁচাতে আমাদের ভূমিকা হতে পারে নিচের মতো:

অভিভাবকদের জন্য

যদি দেখেন আপনার প্রাণবন্ত সন্তান হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেছে, একা থাকতে চাইছে বা স্কুলে যেতে অনীহা দেখাচ্ছে—তবে বুঝবেন ওর মনের ভেতর ঝড় চলছে। তখন গোয়েন্দার মতো জেরা না করে বন্ধুর মতো পাশে বসুন।

কীভাবে বলবেন: > "বাবা, ইদানীং তোমাকে একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে। স্কুলে কি এমন কেউ আছে যে তোমাকে রাগিয়ে দেয় বা তোমার কোনো জিনিস কেড়ে নেয়? তুমি নির্ভয়ে আমাকে

বলতে পারো। তুমি বললে আমি মোটেও রাগ করবো না, বরং আমরা দুজনে মিলে এই সমস্যার সমাধান খুঁজবো।"

আপনার এই একটি আশ্বাস ওকে অনেক বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

শিক্ষকদের জন্য: ক্লাসরুম হোক নিরাপদ দুর্গ

শিক্ষক হলেন ক্লাসরুমের চালক। আপনার সামনে বা পেছনে যখনই কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করবে, সেটাকে 'ছোটদের মজা' বলে এড়িয়ে যাবেন না। তৎক্ষণাৎ বিষয়টি থামিয়ে দিন।

কীভাবে বোঝাবেন: সবাইকে উদ্দেশ্য করে শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলুন—

"কারো শারীরিক গঠন, চশমা বা কথা বলার ধরণ নিয়ে হাসাহাসি করা কোনো বীরত্ব নয়। আমরা এখানে শুধু বই পড়তে আসিনি, মানুষ হতে এসেছি। আমাদের প্রথম পাঠ হলো একে অপরকে সম্মান করা। মনে রাখবে, অন্যকে ছোট করে কেউ নিজে বড় হতে পারে না।"

শিক্ষার্থীদের জন্য

তুমি যদি আবিরের বন্ধু হও বা পাশের বেঞ্চের সহপাঠী হও—তবে মনে রেখো, তোমার চুপ থাকা মানেই বুলিং-কে সমর্থন করা। তুমি সরাসরি ঝগড়া না করেও আবিরকে সাহায্য করতে পারো।

কীভাবে রুখে দাঁড়াবে: তুমি শুধু গিয়ে আবিরের পাশে দাঁড়াও এবং যারা হাসছে তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলো—

"দেখো, এটা মোটেও মজার কিছু নয়। কাউকে কষ্ট দেওয়া ঠিক না। চলো আমরা এই আজেবাজে কাজ বাদ দিয়ে অন্য কোনো খেলা খেলি।" তোমার এই একটা কথাই আবিরের মনে পাহাড়সম সাহস এনে দেবে এবং যারা বুলিং করছে তারা বুঝতে পারবে যে তারা যা করছে তা আসলে সবার চোখে ভুল।

মনে রাখার মতো কিছু কথা:

- বুলিং কোনো সাহসের কাজ নয়, এটি একটি মানসিক দুর্বলতা।
- আজকের ছোট্ট একটি "পঁচানো" বা "নাম ধরে ডাকা" কালকের একটি বড় মানসিক ক্ষতের কারণ হতে পারে।
- আমরা সবাই আলাদা, আর এই আলাদা হওয়াটাই সুন্দর।

আজই আপনার সন্তানের সাথে বা ছাত্রের সাথে কথা বলুন। তাকে জিজ্ঞেস করুন— "আজ স্কুলে এমন কী ঘটেছে যা তোমার মন খারাপ করে দিয়েছে?" শুনুন, বুঝুন এবং তাকে বিশ্বাস দিন যে সে একা নয়।

অধ্যায় ২: আমার সন্তান কি বুলিং-এর শিকার হচ্ছে?

অর্ঘ্যর বদলে যাওয়া দিনগুলো

অর্ঘ্য আগে স্কুল থেকে ফিরেই গড়গড় করে সব গল্প বলত। টিফিনে কে কী আনল, কে ফুটবল খেলতে গিয়ে পড়ে গেল—সব। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অর্ঘ্যর মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। স্কুল থেকে ফিরে ও সোজা নিজের ঘরে চলে যায়। কারো সাথে কথা বলতে চায় না। ওর প্রিয় খাবার 'চিকেন ফ্রাই' সামনে দিলেও ও মন মরা হয়ে বসে থাকে।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো, অর্ঘ্য এখন স্কুলে যাওয়ার নাম শুনলেই কান্নাকাটি করে। কখনো বলে পেট ব্যথা, কখনো বলে মাথা ধরেছে। ওর মা লক্ষ্য করলেন, গত পরশু ওর স্কুল ব্যাগের চেইনটা ছেঁড়া ছিল এবং টিফিন বক্সটা হারানো। মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, অর্ঘ্য শুধু বলল, "আমি জানি না, হারিয়ে গেছে হয়তো।"

লক্ষণগুলো চিনুন

শিশুরা অনেক সময় ভয়ে বা লজ্জায় বুলিং-এর কথা মুখে বলতে পারে না। তাই আপনাকে তার আচরণের ভাষা বুঝতে হবে:

- **হুট করে চুপচাপ হয়ে যাওয়া:** যে বাচ্চা আগে খুব কথা বলত, সে যদি হঠাৎ নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়।
- **স্কুলে যেতে অনীহা:** পেটে ব্যথা বা মাথা ব্যথার মতো অজুহাত দিয়ে স্কুল এড়ানোর চেষ্টা করা।
- **ফলাফল খারাপ হওয়া:** পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যাওয়া এবং রেজাল্ট হঠাৎ খারাপ হওয়া।
- **জিনিসপত্র হারানো বা নষ্ট হওয়া:** স্কুল ব্যাগ, পেন্সিল বক্স বা টিফিন বক্স বারবার হারিয়ে যাওয়া বা ছেঁড়া অবস্থায় থাকা।

- **শরীরের চিহ্ন:** জামাকাপড় নোংরা থাকা বা শরীরে ছোটখাটো আঁচড় বা নীলচে দাগ থাকা (যা সে লুকিয়ে রাখতে চায়)।

সন্তানের সাথে কথা বলা

আমরা অনেক সময় সরাসরি জিজ্ঞেস করি, "স্কুলে কি কেউ তোকে মেরেছে?" এতে শিশু আরও ভয় পেয়ে যায়। সরাসরি প্রশ্ন না করে গল্পের ছলে শুরু করুন:

মা/বাবা: "জানো, আজ অফিসে একটা খুব মজার কাণ্ড হয়েছে! তোমার স্কুলে টিফিনে আজ সবচেয়ে মজার কাজ কী হয়েছে?"

সন্তান: "কিছুই না..."

মা/বাবা: "আচ্ছা, তোমার ক্লাসে এমন কেউ আছে যে খুব বেশি মজা করে? অথবা এমন কেউ যাকে দেখলে তোমার একটু ভয় লাগে বা অস্বস্তি হয়?"

এভাবে কথা বললে শিশু ধীরে ধীরে তার অস্বস্তির কথা বলতে শুরু করবে।

আশ্বাস দেওয়া

যখন আপনার সন্তান কোনো ঘটনার কথা বলবে, তখন খবরদার তাকে বকবেন না (যেমন: "তুই ওকে পাল্টা মারলি না কেন? তুই এতো ভীতু কেন?")। বরং তাকে সাহস দিন।

তাকে এই কথাগুলো বলুন:

- "তুমি যে আমাকে এটা বলেছ, তার জন্য আমি গর্বিত।"
- **"বাবা/মা, এটা তোমার দোষ নয়। তুমি কোনো ভুল করোনি।"**
- "আমি তোমার সাথে আছি। আমরা দুজনে মিলে এটা ঠিক করব।"

সমাধানের পথ

আপনার সন্তান যখন বুলিং-এর শিকার হয়, তখন অভিভাবক হিসেবে আপনি অস্থির হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু এই সময় আপনার শান্ত থাকা এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। সমাধান হিসেবে আপনি নিচের তিনটি কাজ করতে পারেন:

ক. স্কুলের সাথে কথা বলুন: গোপন না রেখে অংশীদার হন

অনেকে ভাবেন স্কুলে নালিশ করলে সন্তানকে হয়তো আরও বেশি বুলিং করা হবে। কিন্তু একা সমাধান করতে যাওয়াটা আরও বিপদজনক।

- **শ্রেণী শিক্ষকের সাথে বসুন:** উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে শিক্ষকের সাথে দেখা করুন। তাকে আবিরের মতো ঘটনার বিস্তারিত খুলে বলুন।
- **প্রমাণ দিন:** যদি কোনো ছেঁড়া খাতা, নষ্ট হওয়া জিনিস বা শরীরের চিহ্ন থাকে, তা দেখান।
- **সহযোগিতা চান:** শিক্ষককে বলুন— "আমি চাই আমার সন্তান স্কুলে নিরাপদ থাকুক। আপনি কি ক্লাসে একটু বাড়তি নজর রাখতে পারেন?" স্কুল এবং অভিভাবক মিলে কাজ করলে বুলিং খুব দ্রুত থেমে যায়।

খ. আত্মবিশ্বাস বাড়ানো: তার ভেতরের শক্তি জাগিয়ে তুলুন

বুলিং-এর কারণে শিশুরা মনে করে তারা "অযোগ্য"। এই ধারণা ভাঙতে হবে।

- **ছোট সাফল্য উদযাপন:** আপনার সন্তান যে কাজটিতে ভালো—হোক সেটা ছবি আঁকা, অংক করা, বাগান করা বা কোনো খেলা—তাকে সেই কাজে বেশি করে উৎসাহিত করুন।
- **নতুন দক্ষতা:** তাকে এমন কোনো শখের কাজে ভর্তি করে দিন যেখানে সে নতুন বন্ধু পাবে এবং নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারবে। যখন সে দেখবে সে কোনো একটি কাজে সফল হচ্ছে, তখন তার ভেঙে পড়া আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে আসবে।
- **সাহস জোগানো:** তাকে শেখান যে তার মূল্য অন্য কারো কথায় বা ঠাট্টায় কমে যায় না।

গ. সহমর্মিতা: আপনিই তার সবচেয়ে বড় ঢাল

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার এবং আপনার সন্তানের মধ্যকার সম্পর্ক। তাকে এই বিশ্বাসটুকু দিন যে পৃথিবী একদিকে হয়ে গেলেও আপনি তার পাশে আছেন।

- **ভরসার জায়গা হওয়া:** সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন— "আমি তোমার ওপর মোটেও রাগ নই। স্কুলে যা ঘটছে তার জন্য তুমি দায়ী নও। আমি তোমার শত্রু নই, বরং আমিই তোমার সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা।"
- **ধৈর্য ধরা:** একদিনে সব ঠিক হবে না। তাকে সময় দিন, তার কথা মন দিয়ে শুনুন এবং তার আবেগকে গুরুত্ব দিন। আপনার ভালোবাসা আর সমর্থনই হবে তার ক্ষত সারানোর সবচেয়ে বড় ওষুধ।

অধ্যায় ৩: আমার সন্তান যদি অন্যকে বুলিং করে?

রাফাত এবং একটি ফোন কল

রাফাতের বাবা অফিস থেকে ফেরার পর স্কুল থেকে একটি ফোন পেলেন। ক্লাস টিচার জানালেন, রাফাত ক্লাসের অন্য একটি ছেলেকে নিয়মিত সবার সামনে 'মোটা' বলে খ্যাপায় এবং তাকে দিয়ে নিজের ব্যাগ বহন করায়।

রাফাতের বাবার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কারণ বাড়িতে রাফাত খুব ভদ্র, বড়দের কথা শোনে। তিনি রাফাতের ওপর খুব রাগ করলেন এবং তাকে মারতে চাইলেন। কিন্তু রাফাতের মা বললেন, "মেরে তো লাভ নেই, আগে বুঝতে হবে ও এমন কেন করছে।"

তারা রাফাতকে শান্তভাবে কাছে বসালেন। দেখা গেল, রাফাত আসলে ক্লাসে নিজেকে 'শক্তিশালী' প্রমাণ করতে চেয়েছিল যাতে সবাই তাকে ভয় পায় এবং সম্মান দেয়। সে আসলে বুঝতেই পারেনি যে তার এই 'মজা' অন্য একটি শিশুর মনে কতটা কষ্টের কারণ হচ্ছে।

স্বীকার করে নেওয়া

যখন আপনি শুনবেন আপনার সন্তান অন্যকে কষ্ট দিচ্ছে, তখন সাধারণ দুটি প্রতিক্রিয়া হয়: হয় আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করি ("আমার বাচ্চা এমন করতেই পারে না"), অথবা অনেক বেশি মারধর করি। দুটিই ভুল।

- **শান্ত থাকুন:** খবরটি শোনামাত্রই সন্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। আগে পুরো ঘটনাটি শান্তভাবে বোঝার চেষ্টা করুন।
- **লেবেল করবেন না:** তাকে "খারাপ ছেলে" বা "বদমাস" বলবেন না। মনে রাখবেন, তার **আচরণটি** খারাপ, সে নিজে মানুষ হিসেবে খারাপ নয়।

সে কেন এমন করছে?

একটি শিশু সাধারণত তিনটি কারণে অন্যকে বুলিং করে:

- **মনোযোগ পাওয়া:** সে হয়তো মনে করে এভাবে আধিপত্য দেখালে সবাই তাকে 'হিরো' ভাববে।
- **অনুকরণ:** সে কি বাড়িতে বা আশেপাশে কাউকে দেখেছে অন্যকে তুচ্ছ করতে? অনেক সময় বড়দের ব্যবহার শিশুরা অজান্তেই শেখে।
- **নিরাপত্তাহীনতা:** সে নিজে হয়তো কোনো কারণে হীনম্মন্যতায় ভুগছে, তাই অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় প্রমাণ করতে চায়।

সমাধান

শান্তভাবে আপনার সন্তানের সাথে কথা বলুন। তাকে অন্যের জুতোয় পা দিয়ে পৃথিবীটা দেখতে শেখান।

মা/বাবা: "বাবা, ভাবো তো, কাল যদি ক্লাসের সবাই মিলে তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে বা তোমার কোনো জিনিস কেড়ে নেয়, তোমার কেমন লাগবে?"

সন্তান: "খুব খারাপ লাগবে, আমার কান্না পাবে।"

মা/বাবা: "ঠিক তাই! তুমি সায়ানকে যা বলেছ, তাতে ওর ঠিক এইরকম কষ্টই হয়েছে। তুমি তো কারো কান্নার কারণ হতে চাও না, তাই না?"

পরবর্তী পদক্ষেপ

শুধুমাত্র 'সরি' বলা যথেষ্ট নয়। তাকে বুঝতে দিন কেন তার আচরণটি ভুল ছিল।

- **দায়িত্ব নিতে শেখানো:** তাকে বলুন সে যেন নিজে গিয়ে সেই বন্ধুটির কাছে ক্ষমা চায়।
- **ক্ষতিপূরণ:** সে যদি কারো কোনো জিনিস নষ্ট করে থাকে, তবে তা মেরামত বা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তাকেই করতে দিন।
- **ভালো কাজের প্রশংসা:** যখন সে কারো সাথে ভালো ব্যবহার করবে বা কাউকে সাহায্য করবে, তখন তার মন খুলে প্রশংসা করুন।

সন্তানকে শাসনের চেয়ে বেশি প্রয়োজন **সঠিক ও ভুলের পার্থক্য** বুঝিয়ে দেওয়া। তাকে শেখান যে অন্যকে ছোট করে নয়, বরং অন্যকে সাহায্য করেই প্রকৃত 'হিরো' হওয়া যায়।

অধ্যায় ৪: ক্লাসরুমে শিক্ষকের ভূমিকা

জয়নাল স্যার ও একটি শান্ত ক্লাস

জয়নাল স্যার খেয়াল করলেন, ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসা ফাহিম ইদানীং খুব অন্যমনস্ক থাকে। ফাহিম আগে অংকে খুব ভালো ছিল, কিন্তু এখন সে বোর্ডে আসতে ভয় পায়। স্যার একদিন ক্লাস শেষে আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেন, টিফিন পিরিয়ডে কয়েকজন ছাত্র ফাহিমের টিফিন বক্স নিয়ে হাসাহাসি করছে এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে।

পরদিন জয়নাল স্যার ক্লাসে ঢুকেই কোনো পড়াশোনা শুরু করলেন না। তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে বড় করে লিখলেন— **"সম্মান"**। তিনি সবাইকে বললেন, "আজ আমরা কেউ কাউকে তুচ্ছ করব না। আজ আমরা একে অপরের একটা ভালো গুণের কথা বলব।" এই একটি ছোট পদক্ষেপ ক্লাসের গুমোট ভাবটা কাটিয়ে দিল এবং ফাহিম বুঝতে পারল যে স্যার সব জানেন এবং তার পাশে আছেন।

নজরে রাখা

শিক্ষক হিসেবে আমাদের মনে রাখতে হবে, বুলিং বা হয়রানি কখনোই কোনো নিয়মতান্ত্রিক সময়ে ঘটে না। এটি সাধারণত ঘটে সেই সব মুহূর্তে যখন কোনো বড় মানুষ আশেপাশে নেই বলে ছাত্ররা মনে করে। তাই একজন শিক্ষকের নজর শুধু বইয়ের পাতায় নয়, ক্লাসরুমের বাইরের আনাচে-কানাচেও থাকা প্রয়োজন।

ক. টিফিন পিরিয়ড তদারকি: বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে কী ঘটছে?

টিফিন পিরিয়ড শিশুদের জন্য আনন্দের সময় হলেও, বুলিং-এর শিকার শিশুদের জন্য এটি সবচেয়ে আতঙ্কের সময়।

- **হালকা পায়চারি:** টিফিন পিরিয়ডে শুধু টিচার্স রুমে বসে না থেকে মাঝে মাঝে ক্লাসরুম বা করিডোরে ঘুরে দেখুন। আপনার উপস্থিতিই অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থামিয়ে দিতে পারে।

- **বিচ্ছিন্ন শিশুদের চেনা:** খেয়াল করুন কারা সবসময় একা বসে টিফিন খাচ্ছে। কেউ কি ইচ্ছা করে সবার থেকে আলাদা থাকছে, নাকি তাকে কেউ আলাদা করে রেখেছে? যারা সবসময় অন্যদের এড়িয়ে চলছে, তাদের সাথে আলাদাভাবে কথা বলুন।

খ. আড়ালে কী ঘটছে: শব্দ এবং নিরবতা বোঝা

বুলিং সবসময় মারামারি দিয়ে হয় না, অনেক সময় ইশারা বা বাজে শব্দের মাধ্যমেও হয়।

- **হঠাৎ কান পাতা:** ক্লাসে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে বা বের হওয়ার ঠিক পরের মুহূর্তে দরজার বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। ছাত্ররা তখন তাদের স্বাভাবিক আচরণ করে। সেখান থেকেই অনেক সত্য বেরিয়ে আসে।

- **বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা শারীরিক ভাষা:** ছাত্রদের চোখের দিকে তাকান। কেউ কি কোনো বিশেষ ছাত্রকে দেখে কুঁচকে যাচ্ছে? ক্লাসে আপনার প্রবেশের পর কেউ কি হঠাৎ খুব বেশি চুপ হয়ে গেল? কারো বসার ধরণ কি খুব গুটিয়ে যাওয়া (ভয়ার্ত)? এই ছোট ছোট শারীরিক সংকেতগুলোই বলে দেয় কার ওপর মানসিক চাপ যাচ্ছে।

গ. টয়লেট ও করিডোর: অদৃশ্য জায়গার তদারকি

টয়লেট এবং স্কুলের করিডোর হলো বুলিং করার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

- **রুটিন চেক:** স্কুলের এমন সব অন্ধকার বা নির্জন জায়গায় নজর দিন যেখানে সাধারণত ছাত্ররা আড্ডা দেয়।

- **পরিবর্তন লক্ষ্য করা:** যদি কোনো ছাত্র বারবার টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি চায় বা টিফিন পিরিয়ডের পুরোটা সময় লাইব্রেরিতে একা বসে থাকে, তবে বুঝতে হবে সে সম্ভবত কোনো কিছু এড়ানোর চেষ্টা করছে।

শিক্ষকের জন্য একটি টিপস

ছাত্রদের মধ্যে এক ধরণের অলিখিত নিয়ম থাকে— "কারো বিরুদ্ধে নালিশ করা যাবে না।" তাই আপনি যদি সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, তবে হয়তো তারা বলবে না। কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ নজর এবং ছাত্রদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার ক্ষমতা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, আপনার একটু সচেতন নজর একটি শিশুর স্কুলের প্রতি ভীতি দূর করে দিতে পারে।

সবাইকে আপন করে নেওয়া

একটি ক্লাসরুম হলো একটি বাগানের মতো, যেখানে হরেক রকমের ফুল থাকে। কেউ হয়তো খুব চটপটে, কেউ আবার লাজুক চড়ুই পাখির মতো। শিক্ষক হিসেবে আপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে প্রতিটি শিশু নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং 'আপন' মনে করে। যখন কোনো শিক্ষার্থী নিজেকে দলের অংশ মনে করে, তখন সে অন্যকে বুলিং করার কথা ভাবতেও পারে না।

ক. গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি: বন্ধুত্বের সেতু তৈরি করা

সাধারণত ক্লাসে চঞ্চল বাচ্চারা এক দলে আর শান্ত বাচ্চারা অন্য দলে মিশে থাকে। এই দূরত্ব মেটাতে গ্রুপ স্টাডি বা প্রোজেক্ট ওয়ার্ক দারুণ কাজ করে।

- **কৌশলী দল গঠন:** গ্রুপ করার সময় নিজেই ছাত্র ঠিক করে দিন। প্রতিটি দলে একজন খুব কথা বলা ছাত্রের সাথে দুজন লাজুক ছাত্রকে রাখুন।
- **যৌথ দায়িত্ব:** এমন কাজ দিন যা একা করা সম্ভব নয়। যেমন—একটি পোস্টার বানানো যেখানে একজন ছবি আঁকবে, একজন তথ্য লিখবে আর একজন সেটা উপস্থাপন করবে। এতে তারা একে অপরের ওপর নির্ভর করতে শিখবে এবং একে অপরের গুণগুলো চিনতে পারবে।

খ. বসার জায়গা পরিবর্তন: নতুন বন্ধুত্ব গড়ার সুযোগ

দেখা যায়, বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা নির্দিষ্ট কিছু বন্ধুর সাথেই বেঞ্চে বসে। এতে ক্লাসে ছোট ছোট আলাদা 'গ্রুপ' তৈরি হয়, যা অনেক সময় বুলিং-এর পরিবেশ তৈরি করে।

- **রোটেশন সিস্টেম:** প্রতি মাসে বা ১৫ দিন অন্তর বসার জায়গা বদলে দিন। প্রথম বেঞ্চের ছাত্রকে পেছনে এবং পেছনের ছাত্রকে সামনে নিয়ে আসুন।
- **ফলাফল:** এতে প্রতিটি ছাত্র ক্লাসের সবার সাথে কথা বলার সুযোগ পায়। যখন একজন ছাত্র অন্য সবার সাথে অন্তত একবার করে বসার সুযোগ পায়, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো আড়াল থাকে না। শত্রুতা কমে বন্ধুত্বের সুযোগ বাড়ে।

গ. একাকীত্ব দূর করা: দায়িত্বের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস

বুলিং-এর শিকার সাধারণত তারাই হয় যারা খুব একা বা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে। এই একাকীত্ব দূর করা শিক্ষকের একটি বড় দায়িত্ব।

- **বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া:** যদি দেখেন কোনো শিক্ষার্থী সবার থেকে আলাদা থাকছে বা টিফিনে একা বসে থাকে, তাকে ছোট ছোট কিছু দায়িত্ব দিন। যেমন—ক্লাসের ডায়েরিটা টিচার্স রুমে পৌঁছে দেওয়া, খাতা সংগ্রহ করা বা ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার করা।
- **স্বীকৃতি:** সে যখন কাজটি করবে, সবার সামনে তাকে একটি ধন্যবাদ দিন। এতে সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে এবং অন্য ছাত্ররাও তাকে সম্মানের চোখে দেখবে। এই ছোট ছোট দায়িত্ব তার মনের ভয় কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে।

শিক্ষকের জন্য একটি বিশেষ নোট:

মনে রাখবেন, আপনার ক্লাসের সবচেয়ে শান্ত বাচ্চাটির দিকেই আপনার নজর সবচেয়ে বেশি থাকা প্রয়োজন। সে হয়তো মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু তার একাকীত্বই বুলিং-এর সুযোগ করে দিতে পারে। আপনি যখন সবাইকে এক সুতোয় গাঁথবেন, তখন আপনার ক্লাসরুম হয়ে উঠবে একটি নিরাপদ দুর্গ।

প্রতিবাদ করতে শেখানো

একটি ক্লাসরুমে যখন বুলিং ঘটে, তখন অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তা দাঁড়িয়ে দেখে। এদের আমরা বলি **'বাইড স্ট্যান্ডার্ড' (Bystanders)** বা নীরব দর্শক। গবেষণায় দেখা গেছে, যদি উপস্থিত সহপাঠীরা প্রতিবাদ করে, তবে অর্ধেকের বেশি বুলিং এক মিনিটের মধ্যেই থেমে যায়। তাই ছাত্রদের এই 'নীরব দর্শক' থেকে 'সাহসী বন্ধু' হয়ে ওঠার পাঠ দিতে হবে।

ক. সাহস দেওয়া: নালিশ বনাম সাহায্য

শিশুদের মনে একটি ভয় থাকে যে, শিক্ষককে বললে তাকে 'নালিশকারী' বা 'চোগলখোর' বলা হবে। এই ধারণাটি আমাদের ভেঙে দিতে হবে।

- **পার্থক্য বুঝিয়ে বলা:** ছাত্রদের শেখান— "কাউকে বিপদে ফেলার জন্য যা বলা হয় তা হলো নালিশ। আর কাউকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য যা বলা হয় তা হলো **সাহায্য**।"
- **মূল্যবোধ তৈরি:** শিক্ষককে জানানো মানে বন্ধুকে রক্ষা করা। এটি কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এক ধরণের সামাজিক বীরত্ব।

খ. প্রতিবাদের ভাষা: সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা

প্রতিবাদ মানেই মারামারি বা ঝগড়া নয়। শিশুদের শেখাতে হবে কীভাবে শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়।

- **বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিবাদ:** তাদের শেখান কীভাবে সরাসরি আক্রমণ না করে পরিবেশটা বদলে দেওয়া যায়।
- **নমুনা কথা:** যেমন কোনো বন্ধুকে উত্ত্যক্ত করতে দেখলে একজন ছাত্র বলতে পারে— *"বন্ধু, তুমি যা করছ তা মোটেও ঠিক নয়। এভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া*

আমাদের ক্লাসের নিয়ম নয়। চলো আমরা বরং স্যারকে জিজ্ঞেস করি এটা কি ঠিক হচ্ছে?" * **দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া:** যখন কেউ বুলিং করছে, তখন প্রতিবাদী বন্ধুটি বলতে পারে— *"আরে শোনো, আজ কি টিফিনে ফুটবল খেলবে? চলো আমরা সবাই মিলে যাই।"* এতে বুলিংকারী তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

গ. গোপনীয়তা রক্ষা: ছাত্রের বিশ্বাস জয় করা

একজন ছাত্র যখন সাহস করে আপনার কাছে কোনো অভিযোগ নিয়ে আসে, তখন শিক্ষক হিসেবে আপনার দায়িত্ব তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

- **নাম প্রকাশ না করা:** কখনোই ক্লাসের সবার সামনে বলবেন না যে— "অমুক আমাকে এসে বলেছে তুমি ওকে মেরেছ।" এতে ওই ছাত্রটি পরবর্তীতে আরও বড় বিপদে পড়তে পারে।
- **কৌশলী হওয়া:** আপনি নিজেই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন এমনভাবে বুলিংকারীর সাথে কথা বলুন। তাকে আলাদা করে ডেকে শাসন বা পরামর্শ দিন।
- **নিরাপদ পরিবেশ:** যখন কোনো শিক্ষার্থী জানবে যে তার নাম গোপন থাকবে, তখনই সে নির্ভয়ে আপনার কাছে আসবে এবং স্কুলের অভ্যন্তরীণ অনেক সমস্যার কথা আপনি আগেভাগেই জানতে পারবেন।

শিক্ষকের জন্য একটি বিশেষ পরামর্শ

আপনি যখন ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থীর সাথে সম্মান দিয়ে কথা বলেন, অন্য শিক্ষার্থীরাও তা শেখে। আপনার আচরণই হলো তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পাঠ। কাউকে শাসন করার সময়ও তাকে সবার সামনে অপমান না করে আলাদা করে ডেকে কথা বলুন।

অধ্যায় ৫: নিরাপদ স্কুল গড়ার পদক্ষেপ

'আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়' কীভাবে বদলে গেল?

'আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়' নামটা শুনতে ভালো হলেও স্কুলের ভেতরে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ছিল না। বড় ক্লাসের ছেলেরা ছোটদের টিফিন কেড়ে নিত, বাথরুমে আটকে রাখত। স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেকবার বকাঝকা করেও লাভ হয়নি।

অবশেষে প্রধান শিক্ষক একটি নতুন পরিকল্পনা নিলেন। তিনি স্কুলের গেটে বড় করে একটি সাইনবোর্ড লাগালেন— **"আমাদের স্কুল বুলিং-মুক্ত এলাকা"**। তিনি প্রতিটি ক্লাসে একটি করে 'গোপন বাক্স' রাখলেন। এক মাসের মধ্যে দেখা গেল, স্কুলের পরিবেশ বদলে গেছে। যারা আগে ভয় পেত, তারা এখন হাসিমুখে স্কুলে আসছে। কারণ তারা জানে, স্কুল তাদের সুরক্ষায় কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

স্পষ্ট নিয়ম

স্কুলের নিয়মগুলো কেবল ডায়েরির শেষ পাতায় বা অফিসের ফাইলে বন্দি থাকলে শিক্ষার্থীরা তার গুরুত্ব বুঝতে পারে না। বুলিং প্রতিরোধের নিয়মগুলো হতে হবে জীবন্ত এবং সবার চোখের সামনে দৃশ্যমান। যখন একটি শিশু স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকবে, তখন থেকেই তাকে অনুভব করতে হবে যে—এটি একটি নিরাপদ জায়গা।

ক. স্লোগান ও পোস্টার: দেয়াল যখন কথা বলে

স্কুলের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বুলিং-বিরোধী বার্তা থাকা জরুরি। এটি শিক্ষার্থীদের মনে প্রতিনিয়ত একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

- **কোথায় লাগাবেন:** স্কুলের বারান্দা, ক্যান্টিন, লাইব্রেরি এবং বিশেষ করে খেলার মাঠ—যেখানে শিক্ষকরা সবসময় থাকেন না।
- **কেমন হবে বার্তা:** বার্তাগুলো খুব সহজ কিন্তু শক্তিশালী হতে হবে।
    - *"আমরা কাউকে ছোট করি না, আমরা সবাই বন্ধু।"*
    - *"তোমার একটি কথা কারো হাসি কেড়ে নিতে পারে, ভেবে কথা বলো।"*
    - *"বুলিং মুক্ত স্কুল, আমাদের গর্ব।"*
- **দৃশ্যমানতা:** রঙিন পোস্টার বা দেয়ালচিত্রের মাধ্যমে এই বার্তাগুলো ফুটিয়ে তুলুন যাতে ছাত্ররা যাতায়াতের পথে এগুলো বারবার দেখে।

খ. শাস্তি ও পুরস্কার: জবাবদিহিতা ও স্বীকৃতি

নিয়ম তখনি কার্যকর হয় যখন তার পেছনে সুনির্দিষ্ট ফলাফল থাকে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক—উভয়কেই এই নিয়ম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে।

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থা:** বুলিং করলে কী ধরণের শাস্তি হতে পারে (যেমন: সতর্কবার্তা, সাময়িক বহিষ্কার বা অভিভাবককে তলব করা), তা আগে থেকেই একটি চার্টের মাধ্যমে নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন। এতে যারা বুলিং করতে চায়, তারা পরিণতির কথা ভেবে সতর্ক হবে।
- **পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহ:** শুধু শাস্তি দিয়ে আচরণ বদলানো যায় না, ইতিবাচক কাজের স্বীকৃতিও প্রয়োজন।
    - **মাসের সেরা বন্ধু (Friend of the Month):** যারা ক্লাসে অন্যকে সাহায্য করে, ঝগড়া থামায় বা একাকী কোনো বন্ধুর পাশে দাঁড়ায়, তাদের জন্য এই পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখুন।
    - **স্বীকৃতি:** স্কুল অ্যাসেম্বলিতে সবার সামনে তাদের নাম ঘোষণা করুন এবং একটি ছোট মেডেল বা সার্টিফিকেট দিন। এতে অন্য শিক্ষার্থীরাও ভালো আচরণ করতে উৎসাহিত হবে।

গ. অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা

ভর্তির সময় বা অভিভাবক সভায় এই নিয়মগুলোর একটি অনুলিপি তাদের হাতে দিন। তাদের বুঝিয়ে বলুন যে, স্কুল এবং বাড়ি—উভয় জায়গায় একই নিয়ম মেনে চললে শিশুর আচরণ দ্রুত উন্নত হয়।

অভিযোগ বক্স

আমরা বড়রা অনেক সময় ভাবি, "কোনো সমস্যা হলে ছাত্ররা তো আমাদের এসে বলবেই।" কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। অনেক শিশু ভয়ে বা লজ্জায় শিক্ষকের কাছে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ করতে পারে না। তাদের মনে ভয় থাকে— *"যদি ওই ছেলেটা জেনে যায় আমি নালিশ করেছি, তবে সে ছুটির পর আমাকে আরও বেশি মারবে।"*অথবা *"স্যার কি আমাকে বিশ্বাস করবেন?"* এই দ্বিধা কাটানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো একটি **'গোপন অভিযোগ বক্স'**।

ক. গোপন অভিযোগ বক্স: সুরক্ষার একটি অদৃশ্য হাত

বক্সটি কোথায় রাখা হচ্ছে, তার ওপর এর কার্যকারিতা নির্ভর করে।

- **সঠিক স্থান নির্বাচন:** স্কুলের এমন কোনো নির্জন জায়গায় বা করিডোরের কোণায় বক্সটি রাখুন যেখানে সিসিটিভি নেই বা যেখানে অন্য ছাত্ররা সবসময় আড্ডা দেয় না। এতে একজন শিক্ষার্থী যখন চিরকুটটি ফেলবে, তখন অন্য কেউ তাকে দেখে ফেলার ভয় পাবে না।
- **নামহীন অভিযোগের সুযোগ:** শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন যে তারা চাইলে চিরকুটে নিজের নাম না লিখেও সমস্যার কথা বা বুলিংকারীর নাম লিখতে পারে। এটি তাদের মনে এক ধরণের নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়।

খ. নিয়মিত তদারকি: দ্রুত ব্যবস্থা ও আস্থা অর্জন

অভিযোগ বক্স রাখাটাই যথেষ্ট নয়, ছাত্ররা যেন বুঝতে পারে যে তাদের অভিযোগের ওপর কাজ হচ্ছে।

- **দায়িত্বশীল তদারকি:** প্রধান শিক্ষক বা এমন কোনো শিক্ষক যাকে শিক্ষার্থীরা খুব পছন্দ করে এবং বিশ্বাস করে, তাকে এই বক্সের দায়িত্ব দিন। তিনি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বক্সটি খুলবেন।
- **তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপ:** কোনো অভিযোগ পাওয়ার পর খুব বেশি দেরি না করে গোপনে বিষয়টি তদন্ত করুন। যদি দেখা যায় কোনো ছাত্র নিয়মিত অন্যকে জ্বালাতন করছে, তবে তাকে সতর্ক করুন।
- **গোপনীয়তা রক্ষা (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ):** অভিযোগকারী ছাত্রের নাম কখনোই কোনো পরিস্থিতিতে প্রকাশ করবেন না। এমনকি বুলিংকারী ছাত্রের অভিভাবকের সামনেও নয়। যখন শিক্ষার্থীরা দেখবে যে অভিযোগ করার পর তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি বরং সমস্যার সমাধান হয়েছে, তখন স্কুলের ওপর তাদের বিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে।

গ. ইতিবাচক সাড়া

মাঝে মাঝে স্কুল অ্যাসেম্বলিতে ছাত্রদের জানান— *"তোমাদের অভিযোগ বক্স থেকে আমরা কিছু সমস্যার কথা জানতে পেরেছি এবং আমরা তার ব্যবস্থা নিচ্ছি। তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের কথা আমাদের জানাবে, আমরা তোমাদের সাথে আছি।"* এই একটি ঘোষণা বুলিংকারীদের মনে ভয় আর ভুক্তভোগীদের মনে সাহস জোগাবে।

অভিভাবক-শিক্ষক সভা

বুলিং বা হয়রানি কেবল স্কুলের চার দেয়ালের মাঝের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি একটি গভীর সামাজিক সমস্যা। একটি শিশু স্কুলে মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকে, বাকিটা সময় সে কাটায়

তার পরিবার আর সামাজিক পরিবেশে। তাই বুলিং নির্মূল করতে হলে মা-বাবাকে এই লড়াইয়ের প্রধান অংশীদার করতে হবে।

ক. বিশেষ আলোচনা: সচেতনতার প্রথম ধাপ

মাসে অন্তত একবার যখন অভিভাবক-শিক্ষক সভা (PTA Meeting) হয়, তখন কেবল রেজাল্ট বা পড়াশোনা নিয়ে কথা না বলে 'বুলিং' নিয়ে একটি বিশেষ সেশন রাখা জরুরি।

- **প্রভাব সম্পর্কে ধারণা:** অনেক অভিভাবক মনে করেন, "বাচ্চারা একটু আধটু দুষ্টুমি করতেই পারে।" তাদের বোঝাতে হবে যে, বুলিং-এর শিকার হওয়া শিশু যেমন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, তেমনি যে শিশু বুলিং করছে সেও আসলে এক ধরণের আচরণগত সমস্যায় ভুগছে যা ভবিষ্যতে তাকে অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে।
- **লক্ষণ শেখানো:** সভায় অভিভাবকদের শেখান কীভাবে বাড়িতে বসে সন্তানের আচরণ দেখে বুঝবেন সে স্কুলে কোনো সমস্যায় পড়ছে কি না। এই আলোচনা অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করে।

খ. সম্মিলিত পরিকল্পনা: শাস্তি নয়, সংশোধন

যদি কোনো শিক্ষার্থী অন্যকে বুলিং করে, তবে তাকে স্কুল থেকে সরাসরি বের করে দেওয়া বা টিসি (TC) দেওয়া সবসময় সঠিক সমাধান নয়। এতে শিশুটি আরও বেশি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।

- **যৌথ কাউন্সিলিং:** বুলিংকারী শিশুর মা-বাবাকে আলাদাভাবে ডাকুন। রাগান্বিত না হয়ে তাদের সাথে বসে বোঝার চেষ্টা করুন—বাড়িতে বা পরিবেশে এমন কিছু কি ঘটছে যা শিশুটিকে আক্রমণাত্মক করে তুলছে?
- **আচরণ পরিবর্তনের অঙ্গীকার:** স্কুল এবং অভিভাবক মিলে একটি পরিকল্পনা করুন। শিশুটিকে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব দিন এবং তার আচরণের উন্নতি হচ্ছে কি না তা দুপক্ষই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন। যখন একটি শিশু দেখবে যে তার শিক্ষক এবং

মা-বাবা দুজনেই তার আচরণের ব্যাপারে একমত এবং সচেতন, তখন সে নিজেকে শুধরে নিতে বাধ্য হবে।

গ. একটি নিরাপদ কমিউনিটি গড়ে তোলা:

সভায় অভিভাবকদের অনুরোধ করুন যেন তারা নিজেদের সন্তানদের অন্যকে সম্মান করতে শেখান। বাড়িতে যেন কারো শারীরিক গঠন, বর্ণ বা আর্থিক অবস্থা নিয়ে বিদ্রূপ না করা হয়। স্কুল এবং বাড়ির পরিবেশ যখন এক হবে, তখন শিশুর মনে কোনো দ্বিধা থাকবে না। সে জানবে যে, অন্যকে কষ্ট দেওয়া কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বুলিং প্রতিরোধে স্কুল হলো বাগান আর অভিভাবক হলেন তার মালি। মালি আর বাগান কর্তৃপক্ষ যখন একসাথে কাজ করে, তখনই প্রতিটি ফুল সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। অভিভাবক-শিক্ষক সভা হোক সেই মিলনের জায়গা, যেখানে প্রতিটি শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শপথ নেওয়া হবে।

স্কুলের জন্য একটি 'অ্যাকশন প্ল্যান'

বুলিং প্রতিরোধে একটি আদর্শ স্কুলের পরিকল্পনা কেবল ক্লাসরুমের চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। স্কুল কর্তৃপক্ষকে এমন কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে হবে যা পুরো ক্যাম্পাসের পরিবেশ বদলে দেবে।

ক. সিসিটিভি ও নজরদারি: অন্ধকার কোণের সুরক্ষা

বুলিং সাধারণত শিক্ষকের চোখের আড়ালে ঘটে। স্কুলের কিছু নির্দিষ্ট জায়গা থাকে যেখানে নজরদারি কম থাকে।

- **হটস্পট চিহ্নিত করা:** সিঁড়ির তলা, স্কুলের পেছনের মাঠ, জরাজীর্ণ ল্যাবরেটরি বা নির্জন করিডোর—এই জায়গাগুলোতেই বুলিংয়ের ঘটনা বেশি ঘটে।

- **প্রযুক্তির ব্যবহার:** এসব 'অন্ধকার কোণে' সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করুন। এটি কেবল অপরাধীকে শনাক্ত করতেই নয়, বরং ছাত্রদের মনে এই সচেতনতা তৈরি করতে সাহায্য করবে যে—সবকিছুই তদারকি করা হচ্ছে। ক্যামেরার অনুপস্থিতিতে সেখানে কোনো আয়া বা পিয়নকে নিয়মিত বিরতিতে চক্কর দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

খ. ছাত্র কাউন্সিল: বড়দের মাঝে ছোটদের নিরাপত্তা

স্কুলের বড় ক্লাসের শিক্ষার্থীদের (যেমন ক্লাস নাইন বা টেন) নেতিবাচক কাজে না জড়িয়ে ইতিবাচক নেতৃত্বের সুযোগ দিন।

- **সুরক্ষা দল (Safe Squad):** বড় ক্লাসের দায়িত্বশীল ও মার্জিত স্বভাবের ছাত্রদের নিয়ে একটি সুরক্ষা দল গঠন করুন। তাদের কাজ হবে টিফিন পিরিয়ডে বা স্কুল ছুটির সময় ছোটদের দেখভাল করা।

- **দায়িত্ববোধ:** যখন একজন বড় ছাত্র জানবে যে ছোটদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব তার, তখন তার নিজের মধ্যে এক ধরণের নেতৃত্বগুণ ও দায়িত্ববোধ তৈরি হবে। ছোটরাও তাদের বড় ভাই বা আপুদের কাছে কোনো বিপদে পড়লে দ্রুত সাহায্য চাইতে পারবে। এটি বড় ও ছোটদের মধ্যে থাকা 'পাওয়ার ইমব্যালেন্স' বা ক্ষমতার দূরত্ব কমিয়ে আনে।

গ. আইন সম্পর্কে সচেতনতা: ডিজিটাল ও বাস্তব আইন

অনেক সময় শিক্ষার্থীরা জানেই না যে তাদের করা একটি কাজ বা মন্তব্য আইনিভাবে অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

- **আইনি ওরিয়েন্টেশন:** বড় ক্লাসের (ক্লাস ৮-১০) শিক্ষার্থীদের নিয়ে বছরে অন্তত একবার আইনি সচেতনতা সভা করুন। তাদের বোঝান যে—কাউকে সামনাসামনি মারধর করা যেমন অপরাধ, তেমনি ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাউকে নিয়ে মানহানিকর কিছু পোস্ট করা (Cyber Bullying) তার চেয়েও বড় অপরাধ।

- **ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন:** বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং এর কঠোর শাস্তির কথা তাদের সহজভাবে জানান। যখন তারা জানবে যে একটি ভুল পোস্টের জন্য তাদের ভবিষ্যৎ ও ক্যারিয়ার নষ্ট হতে পারে, তখন তারা ডিজিটাল জগতে আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল হবে।

এই অ্যাকশন প্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য

স্কুলের প্রতিটি কোণ যেন নিরাপদ থাকে, বড় শিক্ষার্থীরা যেন ছোটদের শত্রু না হয়ে অভিভাবক হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি ছাত্র যেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। এই তিনটি স্তম্ভই একটি স্কুলকে প্রকৃত অর্থে 'বুলিং-মুক্ত' করে তুলবে।

একটি স্কুল তখনই শ্রেষ্ঠ হয়, যখন সেখানে প্রতিটি শিশু নিজেকে নিরাপদ মনে করে। নিয়ম যখন স্পষ্ট থাকে এবং অভিযোগের জায়গা যখন সহজ হয়, তখন বুলিং করার সাহস কেউ পায় না।

অধ্যায় ৬: ডিজিটাল যুগের বিপদ (সাইবার বুলিং)

রাইসার সেই রাত

রাইসা নবম শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্রী। একদিন সে তার প্রিয় একটি মুহূর্তের ছবি ফেসবুকে আপলোড করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখল, ক্লাসের কিছু ছেলে সেই ছবির নিচে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছে। শুধু তাই নয়, রাইসার ছবিটিকে বিকৃত করে একটি 'মিম' (Meme) বানিয়ে স্কুলের মেসেঞ্জার গ্রুপে ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

রাইসা অপমানে আর লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। তার মনে হতে লাগল, কাল স্কুলে গেলে সবাই তাকে নিয়েই হাসাহাসি করবে। সে তার ফোন বন্ধ করে দিল, কিন্তু তার ভেতরের ভয়টা কমল না। সে কাউকে কিছু বলতে পারছিল না, আবার সহ্যও করতে পারছিল না। এই যে ফোনের আড়ালে বসে কাউকে মানসিকভাবে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়া—এটাই হলো **সাইবার বুলিং**।

সাইবার বুলিং আসলে কী?

বাস্তব জগতের বুলিং বা উত্যক্ত করার বিষয়টি সরাসরি দেখা যায়, কিন্তু ডিজিটাল জগতের বুলিং বা **সাইবার বুলিং** অনেক বেশি ভয়াবহ হতে পারে। কারণ এটি ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৭ দিনই চলতে পারে এবং মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে কাউকে মানসিকভাবে হেনস্তা করা বা ভয় দেখানোই হলো সাইবার বুলিং।

এর প্রধান কয়েকটি রূপ নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. ট্রলিং (Trolling): মন্তব্যের আড়ালে বিষ

এটি সাইবার বুলিংয়ের সবচেয়ে সাধারণ রূপ। কারো ছবি, ভিডিও বা স্ট্যাটাসের নিচে গিয়ে বারবার আজেবাজে মন্তব্য করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে রাগিয়ে দেওয়া বা সবার সামনে ছোট করাকেই

ট্রলিং বলে। যারা ট্রল করে, তারা মনে করে এটা হয়তো স্রেফ 'মজা', কিন্তু যাকে নিয়ে করা হয়, তার জন্য এটি চরম অপমানের।

খ. ছবি বিকৃত করা: প্রযুক্তির অপব্যবহার

বর্তমান যুগে ফটোশপ বা এআই (AI) প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই কারো ছবি বদলে ফেলা যায়। বুলিংকারীরা অনেক সময় কোনো সাধারণ মানুষের ছবি নিয়ে সেটিকে নোংরা বা আপত্তিকরভাবে বদলে দিয়ে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। এটি একজনের সামাজিক মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত জীবন মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারে।

গ. গুজব ছড়ানো: মিথ্যার জাল

অনলাইনে কারো সম্পর্কে কোনো ভিত্তিহীন মিথ্যা তথ্য বা তার একান্ত ব্যক্তিগত কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়াও সাইবার বুলিং। একবার একটি গুজব ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে সেটি মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যা ভুক্তভোগীকে দীর্ঘমেয়াদী মানসিক যন্ত্রণায় ফেলে দেয়।

ঘ. আইডি হ্যাক বা ফেক আইডি: পরিচয়ের আড়ালে শত্রুতা

কারো সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল হ্যাক করে সেখান থেকে বাজে কথা পোস্ট করা অথবা কারো ছবি ও নাম ব্যবহার করে একটি ভুয়া (Fake) আইডি খুলে আজেবাজে কথা ছড়ানো। এতে যার নামে আইডি খোলা হয়েছে, তাকে সামাজিকভাবে অপদস্থ হতে হয় এবং অনেকে সত্য না জেনে তাকেই দোষারোপ করে।

কেন সাইবার বুলিং বেশি ভয়ের?

১. **কোনো নিরাপদ জায়গা নেই:** বাস্তব জীবনের বুলিং থেকে বাঁচতে শিশুটি অন্তত বাড়িতে এসে শান্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু সাইবার বুলিং স্মার্টফোনের মাধ্যমে তার বেডরুম পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

২. **বিশাল দর্শক:** ক্লাসে বুলিং করলে হয়তো ১০-২০ জন দেখে, কিন্তু অনলাইনে এটি লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখতে পারে।

৩. **স্থায়িত্ব:** ইন্টারনেটে কোনো কিছু একবার আপলোড হলে তা পুরোপুরি মুছে ফেলা খুব কঠিন।

শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বার্তা:

"তুমি স্ক্রিনের ওপাশে বসে কাকে কী বলছো বা কার ছবি নিয়ে কী করছো, তা হয়তো কেউ দেখছে না। কিন্তু তোমার একটি ছোট মন্তব্য বা শেয়ার করা একটি ছবি অন্য একজনের জীবন অন্ধকার করে দিতে পারে। ডিজিটাল জগতে একজন ভালো মানুষ হওয়া মানেই হলো অন্যকে সম্মান করতে শেখা।"

সোশ্যাল মিডিয়া সচেতনতা

আমরা সন্তানকে সমাজে চলার জন্য যেমন আদবকেতা বা শিষ্টাচার শেখাই, ঠিক তেমনি ডিজিটাল জগতেও কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত। একেই বলা হয় **'নেটকেট' (Netiquette)**। সন্তানদের ইন্টারনেটের অলিগলিতে একা ছেড়ে দেওয়ার আগে নিচের ৩টি পাঠ দেওয়া প্রতিটি মা-বাবার জন্য আবশ্যিক:

ক. সম্মান দেওয়া: কিবোর্ড যোদ্ধা নয়, মানুষ হও

অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা মনে করে, কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিনের আড়ালে বসে কাউকে যা খুশি বলা যায়। তারা ভাবে, সামনাসামনি তো আর বলছে না, তাই এটা হয়তো দোষের কিছু নয়।

- **মূল শিক্ষা:** সন্তানকে খুব স্পষ্টভাবে বোঝান— *"বাবা/মা, তুমি সরাসরি কারো সামনে দাঁড়িয়ে তাকে যে কথাটা বলতে পারবে না, সেটা অনলাইনে লেখাও এক ধরণের অপরাধ।"*
  * **সাহস বনাম কাপুরুষতা:** কিবোর্ডের আড়ালে নিজের পরিচয় লুকিয়ে কাউকে গালি দেওয়া বা বিদ্রূপ করা কোনো বীরত্ব বা সাহসের কাজ নয়, বরং এটি চরম কাপুরুষতা। অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখা যেমন বাস্তবে জরুরি, অনলাইনেও ঠিক সমানভাবে জরুরি।

খ. ব্যক্তিগত তথ্য: নিজের সুরক্ষার চাবিকাঠি নিজের কাছে

ইন্টারনেট এমন একটি জায়গা যেখানে কোনো কিছু একবার শেয়ার করলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

- **গোপনীয়তা রক্ষা:** সন্তানকে শেখান যে তার পাসওয়ার্ড হলো তার ঘরের চাবির মতো—যা কাউকেই (এমনকি খুব কাছের বন্ধুকেও) দেওয়া যাবে না।

- **তথ্য শেয়ারের ঝুঁকি:** নিজের বা পরিবারের একান্ত ছবি, বাসার ঠিকানা, ফোন নম্বর বা বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছে—এই তথ্যগুলো অপরিচিত কাউকে বা কোনো সন্দেহজনক লিঙ্কে শেয়ার করা যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তা তাকে বুঝিয়ে বলুন। তাকে শেখান: *"তুমি ইন্টারনেটে যা পোস্ট করছো, তা তোমার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট হয়ে সারাজীবন থেকে যাবে।"*

গ. আইন সম্পর্কে ধারণা: মজা যখন অপরাধ

অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী জানেই না যে অনলাইনে কাউকে নিয়ে ট্রল করা বা আজেবাজে মন্তব্য করা দেশের আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

- **আইনি জ্ঞান:** বাংলাদেশে **'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' (Digital Security Act)** রয়েছে। এই আইনের অধীনে ইন্টারনেটে কাউকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপমান করা, মানহানি করা বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া গুরুতর অপরাধ।
- **পরিণতি:** এর ফলে শুধু জেল বা মোটা অঙ্কের জরিমানা নয়, বরং একটি আইনি রেকর্ড তার পুরো ভবিষ্যৎ এবং ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিতে পারে। সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন যে, স্রেফ 'মজা' করার অজুহাতে আইন ভেঙে নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়।

অভিভাবকদের জন্য একটি ছোট টিপস

সন্তানকে শুধু "এটা করো না" বা "ওটা করো না" না বলে, তার সাথে আলোচনা করুন। মাঝে মাঝে তাকে জিজ্ঞেস করুন সে অনলাইনে কী দেখছে বা কার সাথে কথা বলছে। আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ নজরদারিই তাকে ডিজিটাল জগতের অন্ধকার দিকগুলো থেকে রক্ষা করবে।

প্রমাণ রাখা ও ব্যবস্থা নেওয়া

আপনার সন্তান যখন ডিজিটাল জগতের কোনো আক্রমণের শিকার হয়, তখন সে প্রচণ্ড মানসিক চাপে থাকে। এই সময় আপনার প্রথম কাজ হলো তাকে শান্ত করা এবং পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেওয়া। আতঙ্কিত না হয়ে নিচের ৪টি কার্যকর পদক্ষেপ অনুসরণ করুন:

ক. স্ক্রিনশট (Screenshot) নিন: প্রমাণের শক্তি

সাইবার বুলিংয়ের ডিজিটাল প্রমাণ খুব সহজেই মুছে ফেলা যায়। তাই অভিযোগকারী কোনো কমেন্ট বা মেসেজ ডিলিট করার আগেই সেটি সংরক্ষণ করা জরুরি।

- **কী করবেন:** আক্রমণাত্মক কমেন্ট, মেসেজ, প্রোফাইল লিঙ্ক এবং সময়সহ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন।
- **কেন জরুরি:** আইনি ব্যবস্থা নিতে চাইলে বা স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করতে চাইলে এই স্ক্রিনশটগুলোই সবচেয়ে বড় এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগই ধোপে টিকবে না।

খ. পাল্টা উত্তর না দেওয়া: ট্রলকে প্রশ্রয় দেবেন না

বুলিংকারীর মূল লক্ষ্যই হলো আপনার সন্তানকে রাগিয়ে দেওয়া বা তাকে মানসিকভাবে ভেঙে ফেলা।

- **সন্তানকে শেখান:** পাল্টা গালি দেওয়া বা জবাব দেওয়া মানেই হলো বুলিংকারীর পাতা ফাঁদে পা দেওয়া। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয় এবং অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই আইনত ফেঁসে যেতে পারেন।
- **মৌনতাই শক্তি:** উত্তর না দিলে বুলিংকারী এক সময় তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং থেমে যায়। নীরবতা এখানে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।

গ. ব্লক ও রিপোর্ট: ডিজিটাল সুরক্ষা ব্যবহার করুন

প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব) নিজেকে রক্ষা করার কিছু বিল্ট-ইন টুল থাকে।

- **ব্লক (Block):** বিরক্তিকর ব্যক্তিকে সাথে সাথে ব্লক করে দিন যাতে সে আর আপনার বা আপনার সন্তানের প্রোফাইল দেখতে না পারে।
- **রিপোর্ট (Report):** ফেসবুক বা প্ল্যাটফর্ম কর্তৃপক্ষের কাছে সেই প্রোফাইল বা কন্টেন্টের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করুন। অনেক রিপোর্ট জমা পড়লে প্ল্যাটফর্ম কর্তৃপক্ষ নিজেই সেই আইডি বন্ধ করে দেয়।

ঘ. স্কুল ও আইনি সহায়তা: যথাযথ কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হওয়া

যদি দেখা যায় বুলিংকারী ব্যক্তি পরিচিত বা একই স্কুলের ছাত্র, তবে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না।

- **স্কুল কর্তৃপক্ষ:** আপনার সংগৃহীত প্রমাণসহ (স্ক্রিনশট) স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কাউন্সিলরের সাথে দেখা করুন। স্কুলের শৃঙ্খলা কমিটির মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব।
- **আইনি পদক্ষেপ:** বিষয়টি যদি চরিত্রহনন, পর্নোগ্রাফি বা জীবননাশের হুমকির পর্যায়ে চলে যায়, তবে দেরি না করে আপনার এলাকার **সাইবার ক্রাইম ইউনিট** বা নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করুন। বাংলাদেশে এখন সাইবার অপরাধ দমনে পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

অভিভাবকদের জন্য টিপস

আমরা অনেক সময় ভাবি, সন্তানের ফোন চেক করা বা ল্যাপটপে পাসওয়ার্ড বসিয়ে দিলেই সে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ডিজিটাল জগতের পরিধি এত বিশাল যে, কেবল যান্ত্রিক নজরদারি দিয়ে তাকে আগলে রাখা অসম্ভব। আসল সুরক্ষা আসে তখন, যখন আপনার সন্তান আপনাকে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং নিরাপদ আশ্রয় মনে করে।

"আপনার সন্তান যখন অনলাইনে থাকে, তখন তার ওপর নজরদারি করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তাকে বিশ্বাস করা। তাকে এমন মানসিক শক্তিতে বড় করুন যেন কোনো বিপদে পড়লে সে দ্বিধাহীনভাবে সবার আগে আপনাকে এসে বলতে পারে— 'মা/বাবা, ইন্টারনেটে কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করছে' বা 'আমি ভুল করে একটা লিঙ্কে ক্লিক করে ফেলেছি'।"

এই বিশ্বাসের পরিবেশ কীভাবে তৈরি করবেন?

- **ভয় নয়, ভরসা দিন:** সন্তান যদি কোনো ভুল করে ফেলে বা অনলাইনে কারো দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে প্রথমেই তাকে বকাঝকা করবেন না। সে যেন ভয় না পায় যে, বললে তার ফোন কেড়ে নেওয়া হবে বা তাকে ইন্টারনেটে নিষিদ্ধ করা হবে। তাকে আশ্বস্ত করুন যে, আপনি তার পক্ষ হয়ে সমস্যাটি সমাধান করবেন।

- **খোলামেলা আড্ডা:** প্রতিদিন অন্তত ১০-১৫ মিনিট ইন্টারনেটের ভালো-মন্দ নিয়ে আড্ডা দিন। সে ইউটিউবে কী দেখল বা নতুন কোনো গেম খেলছে কি না—তা বন্ধুর মতো জানুন। সে যখন দেখবে আপনি তার জগতের প্রতি আগ্রহী, তখন সে কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে আপনাকেই আগে জানাবে।

- **ভুল স্বীকারের সুযোগ:** সন্তানকে শেখান যে মানুষ ভুল করতেই পারে। যদি সে ভুল করে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করে ফেলে, তবে সেটা লুকানোর চেয়ে দ্রুত জানানো বেশি জরুরি। আপনার শান্ত প্রতিক্রিয়া তাকে পরবর্তী বড় বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে।

- **ডিজিটাল গাইড হওয়া:** আপনি নিজে যখন অনলাইনে থাকেন, তখন সন্তানদের সামনে আদর্শ উদাহরণ হয়ে উঠুন। আপনি যদি অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকেন, তবে আপনার সন্তানও সেই নৈতিকতা শিখবে।

ডিজিটাল দুনিয়া আমাদের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে যদি আমরা এর সঠিক ব্যবহার জানি। সাইবার বুলিং-এর বিরুদ্ধে নীরব থাকা নয়, বরং সচেতন হওয়া এবং সঠিক সময়ে কথা বলাই হলো আসল সমাধান।

অধ্যায় ৭: চুপ করে না থেকে প্রতিবাদ

করিডোরের সেই ঘটনা

স্কুলের বারান্দায় টিফিনের সময় জাহিদ দেখল, ক্লাসের সবল কয়েকজন ছেলে শান্ত ছেলে শফিককে ঘিরে ধরেছে। তারা শফিকের ব্যাগটা নিয়ে লোফালুফি করছে আর ওকে ধাক্কা দিচ্ছে। পাশে আরও আট-দশজন ছাত্র দাঁড়িয়ে দেখছিল। কেউ হাসছিল, কেউবা ভয়ে মুখ নিচু করে চলে যাচ্ছিল।

জাহিদও প্রথমে ভয় পেল। সে ভাবল— *"আমি যদি কিছু বলি, তবে ওরাও তো আমাকে মারতে পারে। তার চেয়ে ভালো চুপচাপ নিজের কাজে চলে যাই।"*কিন্তু জাহিদ খেয়াল করল শফিকের চোখ ভিজে উঠেছে। জাহিদ তখন নিজেকে প্রশ্ন করল— *"আমি যদি আজ চুপ থাকি, কাল তো আমার সাথেও এমনটা হতে পারে।"*জাহিদ এগিয়ে গিয়ে বলল, *"বন্ধু, ওকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ? চলো আমরা সবাই মিলে একসাথে খেলি।"*জাহিদের এই এক কথাতেই বাকি দর্শকরাও সাহস পেল এবং বুলিংকারীরা পিছু হটল।

বাইস্ট্যান্ডার (Bystander) বা নীরব দর্শক কারা?

একটি স্কুলে যখন বুলিং-এর মতো ঘটনা ঘটে, তখন সেখানে কেবল আক্রমণকারী আর আক্রান্ত ব্যক্তিই থাকে না। সেখানে আরও একদল মানুষ থাকে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে রহস্যময়। যেকোনো বুলিং-এর ঘটনায় সাধারণত তিন ধরণের চরিত্র দেখা যায়:

১. **বুলিংকারী:** যে ক্ষমতা দেখিয়ে অন্যকে কষ্ট দিচ্ছে।

২. **ভুক্তভোগী:** যে অসহায়ভাবে সেই কষ্ট সহ্য করছে।

৩. **বাইস্ট্যান্ডার (Bystander):** যারা পুরো ঘটনাটি দাঁড়িয়ে দেখছে কিন্তু কিছু বলছে না।

গবেষণায় দেখা গেছে, একটি ক্লাসে যখন বুলিং হয়, তখন প্রায় **৮৫% থেকে ৯০%** শিক্ষার্থীই থাকে এই 'নীরব দর্শক' বা বাইস্ট্যান্ডারের দলে। তারা সরাসরি মারধর করছে না ঠিকই, কিন্তু তাদের নীরবতা বুলিংকারীকে আরও সাহসী করে তোলে।

মানুষ কেন চুপ থাকে? (অদৃশ্য দেয়াল)

আমরা কেন অন্যায় দেখেও এগিয়ে যাই না? এর পেছনে কাজ করে কিছু গভীর মানসিক ভয় এবং দ্বিধা:

- **নিজের ওপর আসার ভয়:** এটি সবচেয়ে বড় কারণ। একজন শিক্ষার্থী ভাবে— *"আমি যদি এখন আবিরকে বাঁচাতে যাই, তবে কাল হয়তো ওই ছেলেগুলো আমাকেও টার্গেট করবে। আমাকেও তো ওরা মারতে পারে বা আমার চশমাটাও তো কেড়ে নিতে পারে!"* এই নিরাপত্তাহীনতা তাকে পাথর করে রাখে।
- **ঝামেলা এড়ানো:** অনেকে মনে করে এটি তাদের ব্যক্তিগত বিষয় নয়। *"এটা তো আবিরের সমস্যা, আমার তো নয়। আমি কেন অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে নিজের টিফিন পিরিয়ড নষ্ট করবো?"* এই উদাসীনতা অপরাধীকে ছাড় দেয়।
- **দলীয় চাপ (Peer Pressure):** যখন দেখা যায় ক্লাসের 'পপুলার' বা প্রভাবশালী ছেলেরা কাউকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, তখন অন্যরাও সেই হাসিতে যোগ দেয় অথবা চুপ থাকে। তারা ভয় পায় যে, প্রতিবাদ করলে তাকে হয়তো সবাই 'আনস্মার্ট', 'প্যানপ্যানে' বা 'ব্যাকডেটেড' ভাববে এবং তাকে বন্ধু তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ প্রশ্ন

"তুমি কি জানো, তোমার এই নীরবতা বুলিংকারীর কাছে এক ধরণের সমর্থন? সে যখন দেখে কেউ তাকে থামাচ্ছে না, তখন সে মনে করে সে যা করছে তা ঠিক। তোমার একটি নিশ্চুপ ভয়ার্ত চাউনিও তাকে উস্কে দিতে পারে।"

আপস্ট্যান্ডার (Upstander) বা সাহসী বন্ধু হওয়া

আমরা আগের অংশে জেনেছি 'বাইস্ট্যান্ডার' বা নীরব দর্শকের কথা। এখন আমরা জানবো এর ঠিক বিপরীত চরিত্রের কথা—যাকে বলা হয় **'আপস্ট্যান্ডার' (Upstander)**। আপস্ট্যান্ডার হলো সেই সাহসী বন্ধু, যে অন্যায় দেখে চোখ ফিরিয়ে নেয় না, বরং নিজের বুদ্ধি আর সাহস ব্যবহার করে সেই অন্যায় থামানোর চেষ্টা করে।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, আপস্ট্যান্ডার হওয়ার জন্য তোমাকে অনেক শক্তিশালী হতে হবে না বা কারো সাথে মারামারি করতে হবে না। তুমি সরাসরি ঝগড়া না করেও নিচের ৪টি বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে প্রতিবাদ করতে পারো:

ক. ভুক্তভোগীর পাশে দাঁড়ানো: বন্ধুত্বের ঢাল

অনেক সময় বুলিংকারীর সাথে কথা বলা মানেই বিষয়টিকে আরও উস্কে দেওয়া। তাই তুমি সরাসরি বুলিংকারীর দিকে নজর না দিয়ে আক্রান্ত বন্ধুর কাছে চলে যাও।

- **কী বলবে:** তাকে উদ্দেশ্য করে বলো— *"চলো বন্ধু, আমরা এখান থেকে লাইব্রেরিতে যাই"* অথবা *"তুমি কি ঠিক আছো? চলো আমরা টিফিনটা ওদিকে গিয়ে খাই।"* * **কেন এটি কাজ করে:** যখন বুলিংকারী দেখে যে তার লক্ষ্যবস্তু (Target) আর একা নেই এবং কেউ তাকে সঙ্গ দিচ্ছে, তখন সে দ্রুত তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

খ. দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া: পরিবেশ বদলে দেওয়া

বুলিংকারীরা সাধারণত দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। তুমি যদি হুট করে কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলে পরিস্থিতি বদলে দাও, তবে তাদের সেই 'মঞ্চ' ভেঙে যাবে।

- **কীভাবে করবে:** বুলিং চলাকালীন হঠাৎ করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলো— *"আরে শোনো, আজ কি অংক স্যার হোমওয়ার্ক চেক করবেন?"* অথবা *"মাঠে কি ফুটবল খেলা শুরু হয়ে গেছে?"* * **কেন এটি কাজ করে:** এই ধরণের অপ্রাসঙ্গিক কথা বুলিংকারীর মনোযোগ নষ্ট করে দেয় এবং সেখানে উপস্থিত দর্শকদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। ফলে বুলিংয়ের উত্তেজনা কমে যায়।

গ. শিক্ষককে জানানো: নালিশ নয়, এটি সাহায্য

অনেকেই মনে করে শিক্ষককে বলা মানেই 'নালিশ' করা। এই ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

- **সঠিক চিন্তা:** তুমি যখন কোনো বন্ধুকে একা রক্ষা করতে পারছো না, তখন দ্রুত কোনো শিক্ষক বা বড় কাউকে জানানোই হলো সবচেয়ে দায়িত্বশীল কাজ। এটি বন্ধুকে কোনো বড় বিপদ থেকে বাঁচানোর একটি **'সাহায্য'**।
- **পরামর্শ:** যদি তুমি ভয় পাও, তবে টিচার্স রুমে গিয়ে একা স্যারের সাথে কথা বলো অথবা স্কুলের অভিযোগ বক্সে একটি চিরকুট লিখে ফেলো।

ঘ. দলবদ্ধ হওয়া: একতাই বল

তুমি যদি একা প্রতিবাদ করতে ভয় পাও, তবে তোমার আরও দুই-তিনজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে ডাকো।

- **কীভাবে করবে:** তোমরা তিন-চারজন বন্ধু একসাথে গিয়ে বুলিংকারীকে শান্তভাবে বলো— *"বন্ধু, তুমি যা করছো তা ঠিক নয়। আমরা চাই না আমাদের ক্লাসে কেউ কাউকে কষ্ট দিক।"*
  * **কেন এটি কাজ করে:** দশে মিলে যখন কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন বুলিংকারী মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। সে তখন বুঝতে পারে যে পুরো ক্লাস তার আচরণের বিরুদ্ধে।

শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ বার্তা

"হিরো হওয়ার জন্য উড়ন্ত পোশাক বা অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন নেই। একজন বন্ধু যখন অন্য বন্ধুর চোখের জল মুছতে এগিয়ে আসে এবং অন্যায়ের সামনে মাথা নত করে না, সেই হলো প্রকৃত হিরো। তুমি আজ আপস্ট্যান্ডার হয়ে একজনের জীবন বদলে দিতে পারো।"

শিক্ষণীয় মূল্যবোধ

আমাদের সন্তানদের এবং শিক্ষার্থীদের কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান দিলেই চলবে না, তাদের হৃদয়ে একটি গভীর নৈতিক মূল্যবোধ গেঁথে দিতে হবে। তাদের খুব পরিষ্কারভাবে একটি কথা শেখাতে হবে:

"অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাও এক ধরণের অন্যায়।"

কেন নীরবতা বিপজ্জনক?

যদি আপনার চোখের সামনে কাউকে অপমান করা হয়, কাউকে নিয়ে ট্রল করা হয় বা কারো গায়ে হাত তোলা হয় আর আপনি কেবল দাঁড়িয়ে দেখেন, তবে আপনি আসলে কার পক্ষে?

- **পরোক্ষ সমর্থন:** আপনি যখন চুপ থাকেন, তখন বুলিংকারী বা অপরাধী মনে করে যে সে যা করছে তা ঠিক। আপনার এই নীরবতাই তাকে আরও সাহসী করে তোলে। অর্থাৎ, চুপ থেকে আপনি পরোক্ষভাবে সেই অপমানকারীকেই সমর্থন করছেন।
- **বিবেকের প্রশ্ন:** প্রতিটি অন্যায়ের ঘটনায় নিরব দর্শক হওয়া মানে নিজের মনুষ্যত্বকে একটু একটু করে মেরে ফেলা। আজ যদি আপনি অন্যের বিপদে চুপ থাকেন, তবে কাল আপনার বিপদে অন্য কেউ কেন এগিয়ে আসবে?

প্রকৃত বীরত্ব কী?

আমাদের সমাজে অনেক সময় ভাবা হয় যে, গায়ের জোর দেখানো বা কাউকে ভয় দেখানোই বীরত্ব। কিন্তু বড় হওয়ার এই পাঠশালায় আমাদের শেখাতে হবে:

- **পাশে দাঁড়ানোই সাহস:** কোনো বন্ধুকে যখন সবাই মিলে হাসাহাসি করছে, তখন সেই ভিড়ে যোগ না দিয়ে একা গিয়ে বন্ধুর হাতটা ধরাই হলো প্রকৃত বীরত্ব।
- **নৈতিক শক্তি:** গায়ের শক্তির চেয়ে মনের শক্তি অনেক বড়। অন্যায়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে "না" বলাটাই হলো সাহসের কাজ।

ছোটবেলা থেকেই এই মূল্যবোধ গড়ে তোলা জরুরি:

মা-বাবা এবং শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো শিশুদের এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা দয়া এবং সহমর্মিতাকে (Empathy) তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ মনে করে। তাদের মনে এই বিশ্বাসটি ঢুকিয়ে দিতে হবে যে— মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানো কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এটিই হলো একজন প্রকৃত মানুষের পরিচয়।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য টিপস

একটি শিশু সহজাতভাবেই অনুকরণপ্রিয়। সে তার চারপাশের বড়দের দেখে শেখে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। তাই শিশুদের 'আপস্ট্যান্ডার' বা প্রতিবাদী হিসেবে গড়ে তুলতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম।

ক. বীরত্বের নতুন গল্প শোনান (উদাহরণ দিন)

আমরা শিশুদের প্রায়ই অতিমানবিক শক্তির অধিকারী সুপারহিরোদের গল্প শোনাই। কিন্তু তাদের এমন সব বাস্তবের 'হিরো'দের গল্প শোনানো দরকার যারা কেবল নৈতিক সাহস দিয়ে পরিবর্তন এনেছেন।

- **বাড়িতে:** ডিনার টেবিলে বা ঘুমানোর আগে আপনার নিজের জীবনের এমন কোনো ঘটনার কথা বলুন যেখানে আপনি কোনো বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী থেকে এমন উদাহরণ দিন যেখানে তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন।

- **স্কুলে:** ক্লাসে এমন সব সাধারণ মানুষের উদাহরণ দিন যারা একা হয়েও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে জয়ী হয়েছেন। যখন শিশুরা দেখবে যে সাধারণ মানুষও বড় পরিবর্তন আনতে পারে, তখন তাদের নিজের ওপর বিশ্বাস বাড়বে।

খ. ভালো কাজের প্রকাশ্যে স্বীকৃতি (প্রশংসা করুন)

আমরা সাধারণত শিশুরা ভুল করলে তাদের শাসন করি, কিন্তু ভালো কাজ করলে অনেক সময় তা এড়িয়ে যাই। ইতিবাচক আচরণের চর্চা বাড়াতে প্রশংসার কোনো বিকল্প নেই।

- **প্রকাশ্যে প্রশংসা:** যখনই দেখবেন কোনো শিশু অন্য কারো চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে, কারো টিফিন ভাগ করে খাচ্ছে বা কেউ বুলিং-এর শিকার হলে শিক্ষকের কাছে এসে সাহায্য চাইছে—তখন সবার সামনে তার প্রশংসা করুন।

- **কী বলবেন:** শুধু "ভালো করেছ" না বলে নির্দিষ্ট করে বলুন— *"জাহিদ আজ যেভাবে শফিকের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাতে আমি খুব গর্বিত। অন্যদের বিপদে এভাবে এগিয়ে আসাই হলো প্রকৃত সাহসের কাজ।"*

- **ফলাফল:** এই প্রশংসা ওই শিশুর আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীরাও একই রকম সাহসী ও দয়ালু হতে উৎসাহিত হয়।

বুলিং থামানোর জন্য আমাদের অনেক শক্তির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু একটু সাহসের। আপনি যখন একজনের পাশে দাঁড়ান, তখন আপনি আসলে পুরো সমাজকে একটি সুন্দর বার্তা দেন।

অধ্যায় ৮: বুলিং-এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

বড়বেলার সেই ছোট স্মৃতি

সুমনা এখন একজন সফল ব্যাংকার। কিন্তু আজও অফিসের মিটিংয়ে সবার সামনে কথা বলতে গেলে তার হাত-পা কাঁপতে থাকে। কেন জানেন? ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় সুমনার তোতলামি নিয়ে ক্লাসের কিছু বন্ধু প্রতিদিন হাসাহাসি করত। তাকে দেখলেই তারা বলত, *"সুমনা, কথা বলতে কি ইন্টারনেটের মতো বাফারিং হচ্ছে?"*

সেই হাসাহাসি আজ পনেরো বছর আগের ঘটনা। কিন্তু সুমনার মনের ভেতর আজও সেই দিনগুলোর ভয় গেঁথে আছে। সে আজও মনে করে, সে হয়তো সবার সামনে কথা বলার অযোগ্য। ছোটবেলার সেই বুলিং সুমনার আত্মবিশ্বাসকে আজীবন এক অদৃশ্য শিকলে আটকে রেখেছে।

ছোটবেলার ক্ষত

আমরা অনেক সময় ভাবি, "বাচ্চা মানুষ, বড় হলে সব ভুলে যাবে।" কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বলছে ভিন্ন কথা। বুলিং কেবল সাময়িক কোনো মন খারাপের বিষয় নয়; এটি একটি শিশুর কচি মনের কাঠামোকে স্থায়ীভাবে দুমড়েমুচড়ে দিতে পারে। শৈশবের এই ক্ষতগুলো অনেক সময় বড় হয়েও মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর কালো ছায়া ফেলে রাখে।

বুলিং-এর শিকার হওয়া একটি শিশুর মনে মূলত তিনটি প্রধান পরিবর্তন ঘটে:

ক. আত্মবিশ্বাসের অভাব (Low Self-esteem): নিজের চোখে নিজে ছোট হওয়া

বুলিং-এর শিকার শিশুটি যখন বারবার শুনতে থাকে যে সে "আনস্মার্ট", "প্যানপ্যানে" বা "চশমা-ভুত", তখন সে অবচেতনভাবেই তা বিশ্বাস করতে শুরু করে।

- **ভুল ধারণা:** সে ভাবতে থাকে— *"সবাই যখন আমাকে পঁচাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই আমার মধ্যেই কোনো বড় সমস্যা আছে। আমি বোধহয় সত্যিই কারো বন্ধু হওয়ার যোগ্য নই।"*

- **প্রভাব:** এই হীনম্মন্যতা তার পড়াশোনা, খেলাধুলা এবং সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়। সে কোনো কাজে হাত দিতে ভয় পায়, পাছে আবার কেউ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।

খ. দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা (Anxiety & Depression): সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকা

একটি শিশুর কাছে স্কুল হওয়া উচিত ছিল আনন্দের জায়গা, কিন্তু বুলিং-এর কারণে সেটি হয়ে ওঠে আতঙ্কের কেন্দ্র।

- **মানসিক চাপ:** সে সারাক্ষণ এই উদ্বেগে (Anxiety) থাকে যে— *"আবার কখন কেউ আমার চশমাটা কেড়ে নেবে? আবার কখন টিফিন পিরিয়ডে সবাই আমাকে ঘিরে ধরবে?"*
  * **বিষণ্ণতা:** এই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ থেকে শিশুটি ধীরে ধীরে ডিপ্রেশনে চলে যায়। সে খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দেয়, ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না এবং জীবনের স্বাভাবিক আনন্দগুলো হারিয়ে ফেলে।

গ. সামাজিক ভীতি: একাকীত্বের অন্ধকার গহ্বর

বুলিং একটি শিশুকে মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী করে তোলে। সে মনে করে পৃথিবীটা তার জন্য নিরাপদ নয়।

- **মিশতে বাধা:** সে নতুন বন্ধু বানাতে ভয় পায়। স্কুলের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা কারো জন্মদিনের দাওয়াতে যেতে তার বুক ধড়ফড় করে।
- **দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব:** এই ভয় কেবল শৈশবে সীমাবদ্ধ থাকে না। বড় হয়ে কর্মক্ষেত্রে বা পারিবারিক জীবনেও সে মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারে না। অন্যদের চেয়ে নিজেকে সবসময় গুটিয়ে রাখার একটি প্রবণতা তার মধ্যে তৈরি হয়।

অভিভাবকদের জন্য একটি জরুরি বার্তা

"শরীরের ক্ষত মলম লাগালে সেরে যায়, কিন্তু মনের ক্ষত অদৃশ্য। আপনার সন্তান যখন বলে সে স্কুলে যাবে না বা তার পেটে ব্যথা করছে, তখন তার শরীরের চেয়ে বেশি তার মনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন। সময়মতো এই ক্ষত সারাতে না পারলে, এটি তার সারা জীবনের আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিতে পারে।"

লক্ষণগুলো চেনা

সব শিশু আবিরের মতো স্কুলের নাম শুনলে কেঁদে দেয় না; অনেকে নিজের কষ্টটা মনের গভীরেই চেপে রাখে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পাবেই। অভিভাবক ও শিক্ষক হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা।

ক. ঘুমের সমস্যা: অবচেতন মনের চিৎকার

ঘুম হলো মনের আয়না। যখন একটি শিশু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে, তখন তার প্রভাব সবার আগে পড়ে ঘুমের ওপর।

- **কী ঘটে:** রাতে বারবার জেগে ওঠা, দুঃস্বপ্ন দেখে ঘামতে থাকা বা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠা। এমনকি যে শিশুটি আগে একা ঘুমাত, সে এখন হঠাৎ করে মা-বাবার কাছে ঘুমানোর জন্য জেদ করতে পারে।
- **কেন হয়:** অবচেতন মনে সে সেই সব ভয়ংকর মুহূর্তগুলো বারবার দেখতে থাকে যা স্কুলে তার সাথে ঘটেছে।

খ. খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন: আবেগ ও পুষ্টির সংঘাত

খাওয়ার অভ্যাসের আকস্মিক পরিবর্তন মানসিক চাপের একটি বড় সংকেত।

- **খাবার কমিয়ে দেওয়া:** প্রিয় খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। সে হয়তো বলবে তার "খিদে নেই" অথবা মুখটা মলিন করে বসে থাকবে।
- **অতিরিক্ত খাওয়া (Stress Eating):** অনেক শিশু আবার নিজের মানসিক কষ্ট ভোলার জন্য বা অবচেতন মনে আরাম পাওয়ার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেতে শুরু করে।

গ. পড়াশোনায় অনীহা: মনোযোগের ঘাটতি

যে শিশুটি আগে পড়াশোনায় খুব মনোযোগী ছিল এবং নিয়মিত অংক বা বিজ্ঞানে ভালো করতো, তার ফলাফলের গ্রাফ হঠাৎ নিচের দিকে নামতে থাকা একটি চিন্তার বিষয়।

- **মনোযোগ হারানো:** বুলিং-এর শিকার শিশুটি ক্লাসে পড়ার চেয়েও বেশি এই চিন্তায় থাকে যে টিফিন পিরিয়ডে তাকে আবার কোন লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। এই বিভীষিকা তার মেধা ও মননকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ঘ. শারীরিক উপসর্গ: যখন মন কথা বলে শরীরের মাধ্যমে

মাঝে মাঝে শিশুরা এমন সব শারীরিক সমস্যার কথা বলে যার কোনো ডাক্তারী বা প্যাথলজিক্যাল কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

- **বারবার অসুস্থতা:** প্রায় প্রতিদিন সকালে স্কুল ড্রেস পরার সময় পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা বা বমি বমি ভাব হওয়া।
- **আসল রহস্য:** চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে বলা হয় **সাইকোসোমাটিক সিম্পটম (Psychosomatic symptoms)**। এটি কোনো বাহানা নয়; বরং তীব্র মানসিক ভয় আর উদ্বেগের কারণে শরীরের ওপর যে চাপ পড়ে, তার ফলেই এই ব্যথাগুলো অনুভূত হয়।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য বিশেষ পরামর্শ

যদি দেখেন আপনার ছাত্র বা সন্তান এই লক্ষণগুলোর একটি বা একাধিক প্রকাশ করছে, তবে তাকে "পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছে" বা "নাটক করছে" বলে উড়িয়ে দেবেন না। বরং তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বন্ধুর মতো কথা বলুন।

"শিশুর শরীর যদি অসুস্থ হয় তবে আমরা ডাক্তার দেখাই, কিন্তু তার আচরণ যখন বদলে যায়— তখন তার মনে কোনো ক্ষত হয়েছে কি না তা দেখার দায়িত্ব আমাদের।"

প্রফেশনাল সাহায্য

একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে আমাদের বুঝতে হবে যে, সব মানসিক ক্ষত শুধু আদর বা আশ্বাসে সারে না। যেমন শরীরের গভীর ক্ষতে অস্ত্রোপচার বা বিশেষ ওষুধের প্রয়োজন হয়, তেমনি মনের গভীর আঘাত সারিয়ে তুলতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হতে পারে। নিচের পরিস্থিতিগুলোতে দেরি না করে প্রফেশনাল সাহায্য নেওয়া জরুরি:

ক. যখন শিশু নিজেকে আঘাত করার কথা বলে: লাল সংকেত (Red Flag)

এটি সবচেয়ে বড় বিপদ সংকেত। যদি আপনার সন্তান কখনও বলে যে— "আমি মরে যেতে চাই," "আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই," অথবা সে যদি নিজের হাত কাটা বা নিজেকে কোনোভাবে আঘাত করার চেষ্টা করে, তবে এটিকে কোনোভাবেই হালকাভাবে নেবেন না। এটি তার মনের চরম হাহাকার। এই অবস্থায় এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে একজন মনোবিদের কাছে নিয়ে যান।

খ. দীর্ঘস্থায়ী অস্বাভাবিক আচরণ: এক মাসের বেশি সময়

সাময়িক মন খারাপ দু-চার দিনে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যদি দেখেন আপনার সন্তান টানা এক মাসের বেশি সময় ধরে একদম চুপচাপ হয়ে আছে, কারো সাথে কথা বলছে না, সারাক্ষণ ঘরের কোণে অন্ধকার করে বসে থাকছে বা অকারণে কান্নাকাটি করছে—তবে বুঝতে হবে এটি সাধারণ কোনো মন খারাপ নয়, বরং এটি বিষণ্ণতা বা ডিপ্রেশনের লক্ষণ হতে পারে।

গ. তীব্র আতঙ্ক (Panic Attack): যখন শরীর বিদ্রোহ করে

স্কুলের কথা শুনলেই যদি দেখেন আপনার সন্তান অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে, ঘামছে, তার দম আটকে আসছে (শ্বাসকষ্ট) বা সে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে—তবে বুঝবেন সে 'প্যানিক অ্যাটাক' বা তীব্র উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটি নির্দেশ করে যে তার মনের ওপর চাপ নেওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।

আমাদের করণীয়

এই অবস্থায় একজন **স্কুল কাউন্সিলর** বা **চাইল্ড সাইকোলজিস্টের (শিশু মনোবিজ্ঞানী)** পরামর্শ নিন। বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে আপনার সন্তান "পাগল" বা তার কোনো বড় "ব্যর্থতা" আছে।

মনে রাখবেন

"মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া কোনো লজ্জার বিষয় নয়; বরং এটি আপনার সন্তানকে একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। সময়মতো কাউন্সিলিং একটি শিশুকে আত্মঘাতী চিন্তা থেকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় হাসিখুশি জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারে।"

আশ্বাস দেওয়ার সঠিক ভাষা

আপনার সন্তান যখন চরম মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যায়, তখন সে নিজেকে খুব একা এবং তুচ্ছ মনে করে। এই সময় আপনার এবং পরিবারের সদস্যদের বলা কথাগুলো তার জন্য ওষুধের মতো কাজ করবে। বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার পাশাপাশি বাড়িতে তাকে প্রতিনিয়ত এই কথাগুলো বলে আশ্বস্ত করুন:

১. "আমরা তোমার সাথে আছি, তুমি একদম একা নও।"

বুলিং-এর শিকার হওয়া শিশু মনে করে পুরো পৃথিবী তার বিরুদ্ধে। তাকে এই নিরাপত্তার অনুভূতি দিন যে, যাই ঘটুক না কেন—মা, বাবা এবং তার পরিবার তার পাশেই আছে।

- **কেন এটি বলবেন:** এতে তার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাবে যে তার অন্তত একটি 'নিরাপদ ঘাঁটি' আছে যেখানে তাকে কেউ বিচার (Judge) করবে না বা হাসাহাসি করবে না।

২. "বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া মানে তোমাকে সুস্থ করার একটা চেষ্টা, এতে ভয়ের কিছু নেই।"

কাউন্সিলর বা মনোবিদের কাছে যাওয়া নিয়ে অনেক শিশুর মনে ভয় থাকে। তারা ভাবে তারা কি তবে "পাগল" হয়ে গেছে?

- **কেন এটি বলবেন:** তাকে বুঝিয়ে বলুন যে যেমন শরীরের জ্বর হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, মনের মেঘ কাটাতে তেমনি বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হয়। এটি তার কোনো ব্যর্থতা নয়, বরং নিজেকে ভালোবাসার একটি উপায়।

৩. "আমরা জানি তুমি অনেক সাহসী, আমরা একসাথে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবো।"

তাকে তার হারানো শক্তি মনে করিয়ে দিন। তাকে বলুন যে সে যা সহ্য করেছে তা অত্যন্ত কঠিন ছিল, কিন্তু সে দমে যায়নি—এটাই তার বড় বীরত্ব।

- **কেন এটি বলবেন:** 'একসাথে' শব্দটি তাকে সাহস জোগাবে। সে জানবে যে এই কঠিন পথে তাকে একা হাঁটতে হবে না, তার মা-বাবা তার হাত ধরে এই মেঘলা আকাশ কাটিয়ে সূর্যের আলোতে নিয়ে যাবে।

৪. "তোমার কোনো দোষ নেই।"

বুলিং-এর শিকার শিশুরা সবসময় নিজেকে দোষী ভাবে। তারা ভাবে, "আমি হয়তো দেখতে খারাপ" বা "আমি হয়তো বোকা, তাই সবাই আমাকে পঁচায়।"

- **কেন এটি বলবেন:** তাকে বারবার মনে করিয়ে দিন যে অপরাধ বুলিংকারীর, তার নয়। সে যেমন আছে, সেভাবেই সে অনন্য এবং সুন্দর।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য একটি বিশেষ পরামর্শ

"শিশুর শরীরের আঘাত যেমন আমরা ব্যান্ডেজ দিয়ে সারিয়ে তুলি, মনের আঘাতের জন্যও তেমনি যত্নের প্রয়োজন। তাদের বারবার বলুন— 'আমি জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে, এবং আমি তোমার এই কষ্ট কমাতে তোমার পাশে আছি'।"

বুলিং-এর প্রভাব শরীর থেকে মুছে গেলেও মন থেকে সহজে মোছে না। তাই সময়মতো লক্ষণ চেনা এবং শিশুকে নিরাপদ অনুভব করানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অধ্যায় ৯: ডিজিটাল সুরক্ষা ও প্রাইভেসি

সিয়ামের সেই ভুল এবং একটি শিক্ষা

সিয়াম ক্লাস টেনের ছাত্র। ইভান তার খুব কাছের বন্ধু। একদিন কথায় কথায় সিয়াম তার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড ইভানকে দিয়ে দিল। কিছুদিন পর তাদের মধ্যে একটি ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া হলো। ইভান রাগের মাথায় সিয়ামের আইডিতে ঢুকে তার ব্যক্তিগত কিছু মেসেজ স্ক্রিনশট নিয়ে স্কুলের মেসেঞ্জার গ্রুপে ছেড়ে দিল।

সিয়াম দিশেহারা হয়ে গেল। সে ভাবল, *"ইভান তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, ও এমন কেন করল?"* আসলে ডিজিটাল দুনিয়ায় 'বন্ধুত্ব' আর 'প্রাইভেসি' বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। সিয়ামের এই ছোট ভুলটি তার জন্য অনেক বড় মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ছবি ও পাসওয়ার্ড

আমাদের সন্তানদের একটি বাস্তব সত্য খুব স্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে: **ইন্টারনেটে কোনো কিছু একবার শেয়ার করলে তা চিরতরে সেখানে থেকে যেতে পারে।** এটি অনেকটা ঝড়ো বাতাসে কাগজের টুকরো ছড়িয়ে দেওয়ার মতো—যা আর কখনোই পুরোপুরি কুড়িয়ে ফিরিয়ে আনা যায় না। ডিজিটাল জগতে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ৩টি বিষয় মেনে চলা বাধ্যতামূলক:

ক. পাসওয়ার্ড হলো ঘরের চাবি: একান্ত গোপন

আমরা যেমন আমাদের ঘরের আসল চাবি কোনো অপরিচিত মানুষকে দিই না, এমনকি খুব কাছের বন্ধুকেও দিয়ে রাখি না—পাসওয়ার্ড ঠিক তেমনই।

- **কেন গোপন রাখবেন:** অনেক সময় আবেগের বশে বা বন্ধুত্বের খাতিরে কিশোর-কিশোরীরা একে অপরকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পাসওয়ার্ড শেয়ার করা মানে নিজের ব্যক্তিগত ড্রয়িংরুমের চাবি অন্যকে দিয়ে দেওয়া।

- **পরামর্শ:** পাসওয়ার্ড হতে হবে কঠিন (নাম্বার, চিহ্ন ও অক্ষরের সংমিশ্রণ) এবং এটি নিয়মিত পরিবর্তন করা উচিত।

খ. ছবির ব্যবহার: একবার পাঠালে আর ফেরত নেই

নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ছবি কাউকে পাঠানোর আগে অন্তত দুবার ভাবুন। যাকে আজ আপনি পরম বন্ধু ভেবে ছবি পাঠাচ্ছেন, ভবিষ্যতে সে সেই ছবির অপব্যবহার করবে না—তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

- **সন্তানদের শেখান:** *"আজকের সবচেয়ে কাছের বন্ধুটি পরিস্থিতির কারণে কালকের শত্রু হতে পারে। কিন্তু তোমার শেয়ার করা সেই ছবিটি ইন্টারনেটে সারাজীবন থেকে যাবে।"* *
  সতর্কতা: কোনো আপত্তিকর বা অতি-ব্যক্তিগত ছবি ইন্টারনেটে আপলোড বা কাউকে ইনবক্সে পাঠানো মানেই হলো নিজের মান-সম্মান অন্যের হাতে তুলে দেওয়া। একবার কোনো ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে তা মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব।

গ. টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA): নিরাপত্তার দ্বিতীয় স্তর

শুধু পাসওয়ার্ড দিয়ে এখনকার ডিজিটাল যুগে সুরক্ষিত থাকা কঠিন। এজন্য নিরাপত্তার একটি 'বাড়তি তালা' ব্যবহার করা শিখতে হবে।

- **কীভাবে কাজ করে:** এটি হলো ফোনে ওটিপি (OTP) আসার সিস্টেম। কেউ যদি আপনার পাসওয়ার্ড জেনেও যায়, তবুও আপনার ফোনের সেই বিশেষ কোডটি ছাড়া সে আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারবে না।
- **ডিজিটাল তালা:** এটিকে আপনার ডিজিটাল বাড়ির একটি মজবুত গেট হিসেবে কল্পনা করুন। প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে এই 2FA অপশনটি চালু রাখা এখন সময়ের দাবি।

অভিভাবকদের জন্য একটি বিশেষ অনুরোধ

আপনার সন্তানের সাথে বসে তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের সিকিউরিটি সেটিংসগুলো একবার চেক করুন। তাকে কারিগরিভাবে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি নৈতিকভাবে সচেতন করে তুলুন।

"ডিজিটাল নিরাপত্তা কেবল সফটওয়্যার বা পাসওয়ার্ডে নেই, এটি আছে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বুদ্ধিমত্তায়।"

অনলাইন ট্রলিং ও আইনি অপরাধ

বর্তমান প্রজন্মের অনেক কিশোর-কিশোরী মনে করে, ইন্টারনেটে কাউকে নিয়ে হাসাহাসি করা, কারো ছবির ওপর আজেবাজে কথা লিখে 'মিম' (Meme) বানানো বা কাউকে ট্রল করা খুব 'কুল' (Cool) বা স্মার্ট কাজ। কিন্তু পর্দার আড়ালে বসে করা এই তথাকথিত 'মজা' যে আসলে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ, সেটি তাদের স্পষ্টভাবে জানানো জরুরি।

ক. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন: আইনের হাত অনেক লম্বা

বাংলাদেশে ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধে কঠোর আইন রয়েছে। সাইবার বুলিং কেবল নৈতিক অপরাধ নয়, এটি একটি রাষ্ট্রীয় অপরাধ।

- **গুরুতর অপরাধ:** এই আইনের অধীনে ইন্টারনেটে কাউকে মানহানি করা, কারো ছবি বিকৃত (Edit) করে ছড়িয়ে দেওয়া, কারো ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করা বা অনলাইনে কাউকে হুমকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।
- **শাস্তি:** এই ধরণের অপরাধের প্রমাণ মিললে মোটা অঙ্কের জরিমানা এবং দীর্ঘমেয়াদী জেলের বিধান রয়েছে। একবার যদি কারো নামে সাইবার অপরাধের রেকর্ড তৈরি হয়, তবে ভবিষ্যতে তার উচ্চশিক্ষা, ভালো চাকরি বা পাসপোর্ট পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

খ. মজা বনাম অপরাধ: পার্থক্যটা কোথায়?

সন্তানদের শেখাতে হবে যে, যা অন্যকে ছোট করে তা কখনোই 'মজা' হতে পারে না।

- **সাইবার হ্যারাসমেন্ট:** কারো শরীরের গঠন (বডি শেমিং), গায়ের রঙ, ধর্ম বা পরিবার নিয়ে অনলাইনে একটি তুচ্ছ কমেন্ট করাও 'সাইবার হ্যারাসমেন্ট' বা অনলাইন হয়রানি।

- **একটি কমেন্টের প্রভাব:** আপনার সন্তান হয়তো একটি কমেন্ট করে লগ-আউট করে দিচ্ছে, কিন্তু সেই একটি কমেন্ট অন্য প্রান্তের মানুষটির মানসিক শান্তি কেড়ে নিতে পারে, এমনকি তাকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের দিকেও ঠেলে দিতে পারে।

গ. নৈতিকতার পাঠ: স্ক্রিনের ওপাশেও একজন মানুষ আছে

সন্তানদের মগজে এই নৈতিকতা ঢুকিয়ে দিতে হবে যে—কিবোর্ডের প্রতিটি বাটন টেপার আগে যেন তারা ভাবে, সামনের মানুষটি যদি তাদের ভাই, বোন বা বন্ধু হতো তবে তারা কী করতো?

- **ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট:** মনে রাখবেন, ইন্টারনেটে আপনি যা লিখছেন বা শেয়ার করছেন, তা মুছে ফেললেও তার একটি ছাপ বা 'ফুটপ্রিন্ট' থেকে যায়। আজ যেটিকে আপনি 'স্মার্টনেস' ভাবছেন, কাল সেটিই আপনার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অভিভাবকদের জন্য একটি জরুরি কথা

"আপনার সন্তান যেন ইন্টারনেটে গালি দেওয়া বা ট্রল করাকে 'বীরত্ব' মনে না করে। তাকে শেখান যে—অনলাইনে অন্যকে সম্মান জানানোই হলো প্রকৃত স্মার্টনেস। আইনের ভয়ে নয়, বরং একজন ভালো মানুষ হওয়ার তাগিদ থেকেই যেন সে ডিজিটাল শিষ্টাচার মেনে চলে।"

রিপোর্ট ও ব্লক

সাইবার জগতে যখন কেউ আপনাকে বা আপনার সন্তানকে আক্রমণ করে, তখন ভয় পেয়ে প্রোফাইল ডিলিট করে দেওয়া বা ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া সমাধান নয়। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের হাতে কিছু শক্তিশালী অস্ত্র দিয়েছে, যা ব্যবহার করে আমরা ডিজিটাল সন্ত্রাসীদের থামাতে পারি। এই 'ডিজিটাল ঢাল'গুলো ব্যবহারের সঠিক নিয়ম নিচে দেওয়া হলো:

ক. রিপোর্ট (Report): সমষ্টিগত প্রতিবাদের শক্তি

প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স বা টিকটক) কোনো পোস্ট বা কমেন্টের পাশে তিনটি ডট (...) থাকে, যেখানে 'Report' অপশনটি পাওয়া যায়।

- **কীভাবে কাজ করে:** যদি কেউ কোনো আজেবাজে পোস্ট বা কমেন্ট করে, তবে সেটি সাথে সাথে রিপোর্ট করুন। যদি অনেক মানুষ মিলে একটি নির্দিষ্ট আইডি বা পোস্টের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে, তবে সোশ্যাল মিডিয়া কর্তৃপক্ষ সেই পোস্টটি সরিয়ে দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বুলিংকারীর আইডি চিরতরে বন্ধ করে দেয়। এটি একটি নিরব কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিবাদ।

খ. ব্লক (Block): অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল দূর করা

বিরক্তিকর কাউকে কোনো ধরণের উত্তর না দিয়ে সরাসরি ব্লক করে দিন।

- **কেন জরুরি:** সাইবার বুলিংকারীদের মূল লক্ষ্যই হলো আপনাকে রাগানো বা আপনার কাছ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া (Reaction) পাওয়া। আপনি যখন তাদের গালি বা যুক্তির উত্তর দিতে যান, তারা আরও বেশি প্রশ্রয় পায় এবং বিষয়টি আরও নোংরা দিকে মোড় নেয়।
- **মূল মন্ত্র:** ডিজিটাল জগতের একটি বিখ্যাত প্রবাদ হলো— **"Don't feed the trolls"** (ট্রলকারীদের পাত্তা দেবেন না)। আপনি যখন তাকে ব্লক করে দেবেন, সে তখন তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র—অর্থাৎ আপনার মনোযোগ—হারিয়ে ফেলবে।

গ. প্রমাণ রাখা: আইনি লড়াইয়ের প্রথম ধাপ

কাউকে ব্লক করা বা কোনো কমেন্ট ডিলিট করার আগে একটি অতি জরুরি কাজ আছে। সেটি হলো **স্ক্রিনশট (Screenshot)** নেওয়া।

- **কেন এটি আপনার প্রধান অস্ত্র:** আইডি ব্লক করলে বা সে কমেন্ট ডিলিট করে দিলে পরে আপনি আর প্রমাণ দেখাতে পারবেন না। আইনি ব্যবস্থা নিতে চাইলে বা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে অভিযোগ করতে চাইলে এই স্ক্রিনশটগুলোই হবে আপনার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।
- **টিপস:** স্ক্রিনশটে যেন বুলিংকারীর নাম, প্রোফাইল ছবি এবং সময় স্পষ্ট থাকে। প্রয়োজনে তার প্রোফাইলের লিঙ্কটিও কপি করে রাখুন।

অভিভাবকদের জন্য ডিজিটাল সচেতনতা

- **বন্ধুসুলভ নজরদারি:** সন্তান ইন্টারনেটে কার সাথে কথা বলছে বা কোন গ্রুপে সময় কাটাচ্ছে, সে সম্পর্কে ধারণা রাখুন। তবে এটি গোয়েন্দাগিরি নয়, বরং আড্ডার ছলে জানুন।
- **খোলামেলা কথা বলা:** সন্তানকে শেখান— "অনলাইনে কেউ তোমাকে অস্বস্তিকর কিছু বললে বা ভয় দেখালে লুকাবে না। আমরা বকবো না, বরং তোমাকে সাহায্য করবো।"
- **নিজে উদাহরণ হওয়া:** আপনি নিজে ইন্টারনেটে অন্যদের সম্পর্কে কী লিখছেন বা কেমন কমেন্ট করছেন, সন্তান তা দেখে শেখে। তাই নিজের ডিজিটাল আচরণও সংযত রাখুন।

ডিজিটাল দুনিয়ায় সচেতনতাই হলো সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা। একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড আর সঠিক মানুষের সাথে যোগাযোগের অভ্যাস আপনার সন্তানকে এই অদৃশ্য বিপদ থেকে দূরে রাখবে। কিবোর্ড বা স্মার্টফোন যেন কারো কষ্টের কারণ না হয়, সেই শিক্ষাই হোক আমাদের লক্ষ্য।



খান মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান

খান মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সাইকোলজি গবেষক ও শিক্ষাবিদ, যিনি মানব মন, শিক্ষণতত্ত্ব ও শিক্ষা–উন্নয়ন বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা ও লেখালেখি করে চলেছেন। তাঁর গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কার্যকর প্রয়োগ, শিক্ষার্থী আচরণ বিশ্লেষণ, এবং শেখার প্রক্রিয়ায় মানসিক উপাদানের প্রভাব অনুধাবন করে শিক্ষা মানোন্নয়ন।

তিনি সাইকোলজির ওপর ৮টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, শেখার প্রেরণা এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি শিক্ষা উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম নকশা এবং শিক্ষার্থীর সক্ষমতা মূল্যায়ন বিষয়ে তাঁর ২০টিরও বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে, যা দেশের ভেতর ও বাইরে শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের মাঝে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁর বেশ কিছু বই দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রেফারেন্স বই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

একজন দক্ষ শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি শিক্ষা পরিকল্পনা, গবেষণা, ও নীতিনির্ধারণে যুক্ত থেকে মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কাজ শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগকে মানুষের জীবনের উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।